অদৃশ্য আততায়ী

আগাথা ক্রিস্টি

এক

কক্সবাজার।

সী-বীচের এদিকটায় লোকজনের ভিড় বেশ কম। একটু দূরেই বৌদ্ধ মন্দির। এরপর ছোট একটা কাঁচাবাজার। আরও একটু এগুলে কয়েকটা পাকা বাড়ি নজরে পড়ে।

যে হোটেলটায় আমরা উঠেছি সেটার নাম 'অবকাশ'। দোতলা। ছোট হলেও বেশ ছিমছাম। নভেম্বরের শেষাশেষি টুরিস্টদের ভিড় লেগেই থাকে এসব হোটেলে। তবু ভাগ্য ভাল বলতে হবে আমাদের, কোনরকম ঝামেলা ছাড়াই দোতলায় দক্ষিণমুখী স্যুইট পেয়েছি।

বিকেল প্রায় পাঁচটা। হোটেলের লনে বসে কথা বলছিলাম আসাদের সঙ্গে। ইদানীং শরীরটা ভীষণ ভোগাচ্ছে ওকে। আর তাই তাড়াহুড়ো করে হাওয়া বদল করতে এখানে আসা। নইলে আর সব বছরের মত এবারও পরিকল্পনা করতে করতেই সময় পেরিয়ে যেত।

'সমুদ্রের খোলাবাতাস শরীরে লাগলে খিদেটা কিন্তু বেশ বেড়ে যায়।'

'হুঁ। আর সেই সাথে শরীরটাও চাঙা হয়ে ওঠে,' আসাদের কথায় সায় দিয়ে বললাম। ওর কোলের ওপর রাখা দৈনিক 'জনবার্তা'র একটার বিশেষ খবরের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা, গ্লাইডারে চেপে বঙ্গোপসাগরের ওপর চক্কর দিতে গিয়ে এক ভদ্রলোক যে নিখোঁজ হয়েছেন, সে ব্যাপারে নতুন কোন খবর আছে?'

'নাহ্; সেই একই পুরনো খবর ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে ছেপেছে। মানে, ভদ্রলোক এখনো নিখোঁজ, সার্চ পার্টি পুরোদমে অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছে...ইত্যাদি ইত্যাদি।' পত্রিকাটা ভাঁজ করে পাশের টেবিলে রাখল আসাদ।

'গ্লাইডারসুদ্ধ পানিতেই ডুবে গেছেন বোধহয়।'

'সেরকম সম্ভাবনাই বেশি। অবশ্য পত্রিকায় লিখেছে, বঙ্গোপসাগরে ব্যাপক খোঁজাখুঁজি চলছে। বেশ কদিন হয়ে গেল ভদ্রলোক নিখোঁজ। সত্যি সত্যিই যদি পানিতে ডুবে গিয়ে থাকেন, সেক্ষেত্রে সার্চ পার্টি তাঁকে খুঁজে পাবে বলে মনে হয় না। সামুদ্রিক প্রাণীর খোরাক হলেও অবাক হবার কিছু নেই।'

সূর্যটা ধীরে ধীরে হেলে পড়ছে পশ্চিমে। সন্ধ্যা হতে আর বেশি বাকি নেই। উঠে দাঁড়াল আসাদ। উঠলাম আমিও। হাঁটতে শুরু করলাম সী-বীচের দিকে।

হঠাৎ কি হলো কে জানে! মাত্র কয়েক পা এগিয়েছে এমন সময় ব্যথায় ককিয়ে উঠল আসাদ। কিছু বোঝার আগেই হুমড়ি খেয়ে পড়তে যাচ্ছিল একটা মেয়ের গায়ের ওপর। যেন তৈরিই ছিল মেয়েটা। চট্ করে এক পাশে সরে গিয়ে একটা হাত ধরে ফেলল আসাদের, আর পেছন থেকে পিঠ খামচে ধরলাম আমি। দুজনে ধরাধরি করে হোটেলের লনে পাতা চেয়ারে বসিয়ে দিলাম ওকে। দুজনে বাকি দুটো চেয়ারে বসে পড়লাম। ততক্ষণে সামলে উঠেছে আসাদ। 'হঠাৎ মাথাটা কেমন ঘুরে উঠল,' মেয়েটার দিকে তাকিয়ে বলল ও, 'আমি খুবই দুঃখিত, মিস্... ।'

'আমার নাম এলিজাবেথ গোমেজ; সবাই লিজা বলে ডাকে,' আসাদের কথায় বাধা দিয়ে বলল মেয়েটা।

'আমি আসাদ রহমান। শখের গোয়েন্দা বলতে পারেন। আর এর নাম হাবিব আখন্দ, আমার বন্ধু,' আমার দিকে ইঙ্গিত করে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে বলল আসাদ।

আলাপ জমে উঠল। মেয়েটাকে মোটামুটি সুন্দরীই বলা যায়। বেশভূষায় অনেকটা পাঙ্কদের মত। পরনে জিন্সের ট্রাউজার ও শার্ট। মাথায় বেতের তৈরি সুন্দর একটা হ্যাট শোভা পাচ্ছে। বাজার থেকে খানিকটা দূরে যে গুটিকয়েক সুন্দর বাড়ি নজরে পড়ে, তারই একটার মালিক এই মেয়েটা। তিন পুরুষ ধরে এই এলাকায় বাস করছে ওরা। বাবা-মা নেই মেয়েটার। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় খান সেনাদের গুলিতে মারা পড়েন ওর বাবা। এর বছর দুয়েক পর মা-ও মারা যান। পিতামহ মাইকেল গোমেজের ছিল বিরাট কাঠের ব্যবসা। তবে ওর বাবা ছিলেন সেনাবাহিনীর মেজর। পিতা-পিতামহ দুজনেই বিলাসী জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত ছিলেন। সঞ্চয় করার দিকে নজর ছিল না কারোর। পৈত্রিকসূত্রে শুধু বাড়িটাই পেয়েছে লিজা। কথাবার্তা আর চালচলনে আন্দাজ করতে কষ্ট হয় না, বাপ-দাদার স্বভাব

মেয়েটাও পেয়েছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে অনার্স করেছে ও। এরপর লেখাপড়ায় ক্ষান্ত দিয়ে বাড়িঘর দেখাশোনা আর বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে আড্ডা দিয়েই দিন কেটে যাচ্ছে ওর।

বেয়ারা চা দিয়ে গেল। চায়ে চুমুক দিতে দিতে মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এত বড় বাড়িতে একলা থাকতে অসুবিধা হয় না আপনার?'

'নাহ্; অসুবিধা আর কি! অনেক দিনের পুরনো এক ঝি আছে। ও-ই সবকিছু দেখাশোনা করে। আর ওর স্বামী বাগানে মালীর কাজ করে। মাঝে মধ্যে চট্টগ্রাম থেকে বান্ধবীরা এসে বেড়িয়ে যায়।'

'তবু আপনার সাহস আছে বলতে হবে,' মুচকি হেসে বলল আসাদ, 'নইলে এরকম নির্জন জায়গায় আপনার মত মেয়ের পক্ষে কিছুতেই একা থাকা সম্ভব হত না।'

খিলখিল করে হেসে উঠল মেয়েটা। 'অনেকেই বলে আমার স্বভাব নাকি গেছো মেয়েদের মত। ছোটবেলায় মারামারিতে সমবয়সী ছেলেদের প্রায়ই হারিয়ে দিতাম। আর বড় হয়ে এভাবে একলা থাকার অভ্যেসটা জন্মেছে বাবা মারা যাওয়ার পর।'

চায়ের কাপ তুলে নিল মেয়েটা। 'তবে আজকাল মাঝে মাঝে কেমন যেন ভয় হয়। যখন চুপচাপ শুয়ে থাকি, মনে হয় কতকগুলো ছায়া যেন চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। রাতে ঘুমোনোর সময় এরকমটা হয় বেশি।'

'অনেক সময় নার্ভাস টেনশন থেকে এমনটা হয়,' বললাম।

'কিংবা পারিবারিক কোন অভিশাপ তাড়া করে ফিরছে কিনা কে জানে!' হেসে পরিবেশটাকে হালকা করার চেষ্টা করল আসাদ।

'কেন এরকম হচ্ছে জানি না। তবে ইদানীং কয়েকটা ব্যাপার...' চায়ে চুমুক দিল মেয়েটা।

হঠাৎ কোত্থেকে কয়েকটা মৌমাছি এসে বিরক্তিকর ভনভন শব্দে আমাদের চারপাশে ঘুরতে লাগল। হাত নেড়ে ওগুলোকে তাড়ানোর চেষ্টা করলাম। কিন্তু কাজ হলো না। মাথার হ্যাট খুলে কয়েকটা ঝটকা মেরে মৌমাছিগুলোকে তাড়িয়ে দিল মেয়েটা। হ্যাটটা নামিয়ে রাখল লনের ঘাসে।

'কি যেন বলছিলেন, আপনি...' মেয়েটাকে আগের কথার সূত্র ধরিয়ে দিল আসাদ।

'কি যেন বলছিলাম...' একটু ভাবল মেয়েটা, 'ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে। অবশ্য তেমন কিছু নয়, তবু ঘটনাগুলো বেশ ভাবিয়ে তুলেছে আমাকে।

শুনলে হয়তো হাসি পাবে আপনাদের।'

'বলেই ফেলুন না! কি এমন ঘটনা যা ভাবিয়ে তুলেছে আপনাকে?'

কি যেন ভাবল মেয়েটা। 'প্রথম ঘটনাটা দিন পনেরো আগের। রাত প্রায় দেড়টা-দুটো হবে। হঠাৎ ভারী কিছু পড়ার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। উঠে দেখি, মাথার কাছে টাঙানো বিরাট অয়েলপেইন্টিংটা মেঝেতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। চারদিকে ভাঙা কাচের টুকরো ছড়ানো ছিটানো। মজবুত দড়ি দিয়ে খাটের মাথার দিকের দেয়ালে টাঙানো ছিল ওটা। দেয়ালের প্রায় সঙ্গেই খাটটা। ভাগ্য ভাল যে ওটা আমার মাথায় না পড়ে মেঝেয় পড়েছিল। এর কয়েকদিন পরের ঘটনা। মর্নিং ওয়াক করতে যাচ্ছিলাম সী-বীচের দিকে। হঠাৎ দেখলাম, দূরের ঢিবি থেকে পাথরের একটা বড় চাঁই গড়িয়ে আমার দিকেই আসতে লাগল। মনে হচ্ছিল, আমাকে লক্ষ্য করেই কেউ ওটাকে গড়িয়ে দিয়েছে। চাঁইটা গড়াতে গড়াতে কাছে এসে পড়তেই চট্ করে সরে গেলাম। সেটা গিয়ে আছড়ে পড়ল সমুদ্রের পানিতে। এবারও অল্পের জন্যে বেঁচে গেলাম। শেষ ঘটনাটা ঘটেছে দিন তিনেক আগে। সকাল দশটার দিকে গাড়ি বের করলাম। চট্টগ্রাম যাওয়ার কথা। আমার গাড়িটা মিনি অস্টিন। নিজেই চালাই। তো ঐ দিন গাড়ি স্টার্ট দিয়ে একটু পথ পেরিয়ে যেই ব্রেকে পা দিয়েছি, দেখি ব্রেক ধরছে না। এরকমটা অবশ্য হবার কথা নয়। কারণ কয়েকদিন আগেই পরিচিত এক গ্যারেজ থেকে গাড়িটা সার্ভিসিং করিয়েছি। যা হোক, শেষে একটা গাছের সঙ্গে ধাক্কা লাগিয়ে কোনমতে গাড়িটাকে থামালাম। ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখি, গাড়ির ব্রেক অয়েল ফেলে দেয়া হয়েছে। পরে ঐ গ্যারেজের মেকানিককে জিজ্ঞেস করে জেনেছি, সার্ভিসিংয়ের সময় ব্রেকটাও ঠিক করে দিয়েছিল।' লম্বা একটা দম নিল মেয়েটা। 'পরে অবশ্য ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করে দেখলাম, আসলে এগুলো স্রেফ দুর্ঘটনা ছাড়া আর কিছু নয়। আপনার কি মনে হয়?'

'মনে হচ্ছে আপনার অনুমানই ঠিক। প্রথম দুর্ঘটনাটার কথাই ধরুন না, বিরাট অয়েল-পেইন্টিংটার ভারে পুরনো কর্ড ছিঁড়ে যাওয়া কোন অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। এ ছাড়া ঢিবির গা থেকে প্রায়ই বড় বড় পাথরের চাঁই খসে পড়ার কথা শোনা যায়। মাঝে মধ্যে সেগুলো পথচারীদের জন্য বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আর তৃতীয় দুর্ঘটনাটা স্রেফ গ্যারেজ মেকানিকের গাফিলতি।'

আসাদের কথায় মনে জোর পেল মেয়েটা। 'আমারও তাই মনে হয়। ওগুলো নেহায়েত দুর্ঘটনা ছাড়া আর কিছু নয়,' উঠে দাঁড়াল সে, 'আজ তা

হলে চলি। বাজারের দক্ষিণ দিকের প্রথম বাড়িটাই আমার, নাম "স্বপ্নবিলাস"। সময় করে আসবেন কিন্তু।'

চলে গেল মেয়েটা। তাড়াহুড়ো করে যাবার সময় হ্যাটটা ভুলে ফেলে রেখে গিয়েছে। ওটা হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখতে লাগল আসাদ। হঠাৎ চেহারাটা গম্ভীর হয়ে গেল ওর। আমার দিকে হ্যাটটা বাড়িয়ে দিল। 'ভাল করে দেখে বলো তো জিনিসটায় লক্ষ্য করার মত কিছু আছে কিনা?'

হ্যাটটি নেড়েচেড়ে দেখলাম। ভাল বেতের তৈরি। কিন্তু উল্লেখযোগ্য কোন বৈশিষ্ট্য নজরে পড়ল না। জিনিসটা ওর হাতে ফিরিয়ে দিলাম। 'হ্যাটটা সত্যিই সুন্দর, আর মেয়েটাকে মানিয়ে ছিলও চমৎকার।'

আমার কথায় কিছুটা যেন বিরক্ত হলো আসাদ। 'আমি তোমাকে জিনিসটার ভালমন্দ খুঁটিয়ে দেখতে বলিনি। ওটার অন্য কোন বৈশিষ্ট্য আছে কিনা, সেটাই ভাল করে দেখতে বলেছিলাম।'

হেসে ফেললাম। 'তুমি হচ্ছো শখের গোয়েন্দা। আর সবকিছুতেই রহস্যের গন্ধ শুঁকে বেড়ানো গোয়েন্দাদের একটা বদভ্যাস। আমার চোখে তো কিছুই ধরা পড়ল না। এখন বলো দেখি, ব্যাপারটা কি?'

'হ্যাটটার ঠিক মাথার কাছাকাছি সামনে-পেছনে লক্ষ্য করো।'

আসাদের কথামত হ্যাটটা হাতে নিয়ে ভাল করে পরীক্ষা করলাম। সামনে এবং পেছনে দুদিকেই একই সরলরেখা বরাবর দুটো গোল ছিদ্র।

'ছিদ্র দুটো পিস্তলের গুলির। গুলিটা আর ইঞ্চি দেড়েক নিচু দিয়ে গেলেই মেয়েটার মগজে ঢুকে যেত।'

'মানে! কি বলতে চাও তুমি?'

'যা বলতে চাই সেটা খুবই সহজ। এই দ্যাখো,' মাটি থেকে কি যেন তুলে আমার দিকে বাড়িয়ে দিল ও, 'বুলেট। আমরা যখন কথা বলছিলাম সম্ভবত তখনই ঘটেছে ঘটনাটা। আততায়ী মনে হয় অনেক দূর থেকে তাক করেছিল–তাই লক্ষ্যভেদ করতে পারেনি। এখন কেন যেন মনে হচ্ছে, ঐ দুর্ঘটনাগুলো আসলে দুর্ঘটনা নয়। এসবের পেছনে নিশ্চয়ই কারো হাত আছে।'

'কিন্তু ওকে খুন করে কার কি লাভ? কথাবার্তায় যা বোঝা গেল তাতে বিষয়-সম্পত্তি বলতে মান্ধাতার আমলের বাড়িটা ছাড়া আর কিছু আছে বলে তো মনে হয় না।'

'খুনের মোটিভ সবসময় টাকা পয়সা না–ও হতে পারে।'

'তা ঠিক। কিন্তু–একটা ব্যাপার পরিষ্কার হচ্ছে না। গুলিটা যেই ছুঁড়ে

থাকুক তার শব্দ তো নিশ্চয়ই শুনতে পাওয়া যেত। আর গুলিটা আমাদের পায়ের কাছাকাছিই বা এসে পড়ল কি করে?'

'সাইলেন্সার লাগানো পিস্তলের আওয়াজ শুনতে না পাবারই কথা। আর পেছন দিককার বড় পাথরের চাঁইটাতে ধাক্কা খেয়েই গুলিটা ছিটকে আমাদের পায়ের কাছাকাছি এসে পড়েছে।'

'পিস্তলে সাইলেন্সার লাগানো থাকলেও গুলি করলে টের পাওয়া যায়...।'

'কিন্তু সমুদ্রের গর্জনে ঐ সামান্য শব্দটুকু ঢাকা পড়ে যেতে বাধ্য। উহুঁ, তুমি যাই বলো না কেন, আজ আমাদের সামনে মেয়েটাকে যে খুন করার চেষ্টা চালানো হয়েছে, এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে, হাবিব। আততায়ী এ নিয়ে পরপর চারবার ব্যর্থ হয়েছে। পঞ্চমবারে সে সাফল্যের মুখ দেখলেও দেখতে পারে। চলো, আর দেরি না করে এখনই ওর বাড়ি থেকে ঘুরে আসি।'

লিজার বাড়িতে যখন পৌঁছলাম ঘড়িতে তখন সন্ধ্যে সাতটা। বাড়িটা পুরনো হলেও বেশ মজবুত। দোতলা। মরচে ধরা লোহার গেটের সাথে সাঁটা ছোট একটা টিনের ফলকে লেখা "স্বপ্নবিলাস"। গেট খুলে ভেতরে ঢুকলাম। কলিং বেল টিপতেই মাঝবয়েসী এক মেয়েলোক বেরিয়ে এল। আমাদের আসার উদ্দেশ্য বললাম। ড্রইংরুমে আমাদের বসিয়ে ভেতরে চলে গেল সে। কয়েক মিনিট পর রুমে ঢুকল লিজা। আমাদের দুজনকে দেখে বেশ অবাক হয়েছে সে।

'আপনার হ্যাটটা ফিরিয়ে দিতে এলাম। তখন ভুল করে লনে ফেলে এসেছিলেন,' লিজার দিকে হ্যাটটা বাড়িয়ে দিল আসাদ।

'থ্যাঙ্কস। আমি তো ভেবেই পাচ্ছিলাম না, হ্যাটটা গেল কোথায়! গত শীতে মেলা থেকে কিনেছিলাম এটা। বেশ সুন্দর, তাই না?'

আমরা কোন জবাব দিলাম না। আমাদের গম্ভীর চেহারার দিকে তাকিয়ে একটু যেন ভড়কে গেল লিজা। 'কি ব্যাপার! এত চুপচাপ কেন?'

'আপনারা সঙ্গে কিছু জরুরী কথা আছে,' বলল আসাদ।

'বেশ তো, বলুন না!'

'আজ বিকেলে যে দুর্ঘটনাগুলোর কথা বললেন, এখন মনে হচ্ছে ওগুলো আসলে দুর্ঘটনা নয়।'

'মানে?' অবাক চোখে তাকিয়ে রইল সে আসাদের দিকে।

'মানে, বলতে চাচ্ছি, ঐ দুর্ঘটনাগুলো আপনাআপনি ঘটেনি। ওগুলোর পেছনে কারো হাত আছে।'

'আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে, আমাকে খুন করার জন্য কেউ হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে,' লিজার কণ্ঠে মৃদু তাচ্ছিল্যের আভাস।

লিজার অবজ্ঞা গায়েই মাখল না আসাদ। 'হ্যাঁ, ঠিক তাই। এখন থেকেই আপনার সাবধান হওয়া উচিত।'

'আচ্ছা, না হয় ধরেই নিলাম, আমাকে কেউ খুন করার চেষ্টা চালাচ্ছে। কিন্তু সে ক্ষেত্রে আততায়ীর মোটিভ কি? থাকার মধ্যে তো আছে শুধু এই পোড়ো বাড়িটা; তা–ও আবার ব্যাংকের কাছে বন্ধক দেয়া।'

'খুনের মোটিভ সবসময় টাকা-পয়সা কিংবা সম্পত্তির সঙ্গে জড়িত না-ও হতে পারে। অনেক সময় প্রতিহিংসা, ঘৃণা কিংবা জেলাসীও জোরালো মোটিভ হিসেবে কাজ করে।'

'কিন্তু একটা ব্যাপার পরিষ্কার হচ্ছে না। ঐ দুর্ঘটনাগুলোর পেছনে কারো যে হাত আছে, সে ব্যাপারে এতটা নিশ্চিত হচ্ছেন কিভাবে? ওগুলো তো কাকতালীয় ব্যাপারও হতে পারে!'

'প্রথমে আমিও ঐ রকমই ধারণা করেছিলাম। কিন্তু আপনি চলে আসার পর হঠাৎ করে একটা জিনিস আবিষ্কার করলাম। আর তখন থেকেই মনে হচ্ছে দুর্ঘটনাগুলো শুধুই দুর্ঘটনা নয়–নিখুঁত পরিকল্পনার ফসল। ওগুলোর যে কোন একটাতে আপনি মারা গেলেও সেটাকে খুন বলে সন্দেহ করত না কেউ। কপাল খুবই ভাল বলে তিনবারই অলৌকিকভাবে বেঁচে গিয়েছেন আপনি। আততায়ীকে তাই পরিকল্পনায় কিছুটা অদল বদল করতে হয়েছে। সে চাইছিল খুনটাকে দুর্ঘটনার আবরণে চালিয়ে দিতে। কিন্তু তিন তিনবার ব্যর্থ হওয়ায় আজ একেবারে সরাসরি আঘাত হেনেছে সে। কিন্তু এবারও অসম্ভব কপালগুণে বেঁচে গিয়েছেন আপনি।'

'কিন্তু এসবের মাথামুণ্ডু কিছুই তো বুঝতে পারছি না। আজ আবার আমার উপর হামলা হলো কখন?' চোখ বড় বড় করে আসাদের দিকে তাকাল লিজা।

'এই দেখুন,' লিজার হাত থেকে হ্যাটটা নিল আসাদ, 'এই ফুটো দুটো ভাল করে লক্ষ্য করুন। দুটো ফুটো একই সরলরেখা বরাবর। পিস্তল কিংবা রিভলবার থেকে গুলি ছুঁড়লে ঐ রকম ফুটো হওয়া সম্ভব।'

'আপনার কি ধারণা, আমাকে কেউ গুলি করে খুন করার চেষ্টা করেছিল?'

'হ্যাঁ, আপনি ঠিকই ধরেছেন,' পকেট থেকে গুলিটা বের করে লিজার সামনে মেলে ধরল আসাদ। 'এটা পাওয়া গেছে হোটেলের লনে–যেখানটায় বসেছিলাম। আমরা যখন কথা বলছিলাম, আততায়ী সেই সুযোগটাই নিয়েছে।'

এই প্রথম লিজার চেহারায় স্পষ্ট ভয়ের ছাপ দেখতে পেলাম। কয়েক মুহূর্ত কোন কথাই বলতে পারল না। ওর চেহারা দেখে মনে হলো, ঘটনার গুরুত্ব বোধ শেষ পর্যন্ত উপলব্ধি করতে পেরেছে।

ধীরে ধীরে নিজেকে সামলে নিল লিজা। 'কেউ আমাকে খুন করতে চাইতে পারে, কথাটা বিশ্বাসই হয় না। এমন কোন শত্রুও তো নেই আমার!'

'ইদানীং কারো সঙ্গে কি ঝগড়া-বিবাদ হয়েছিল, আপনার?'

'কই, না তো!'

'হুঁ।' চিন্তিত দেখাচ্ছে আসাদকে। 'বাড়িতে আপনি, ঝি আর মালী ছাড়া আর কে থাকে?'

'বাড়ির পেছন দিকে আধাপাকা গোটা তিনেক ঘর আছে। ওখানে থাকেন মি, ও মিসেস ডি কস্টা আর তাদের তেরো-চোদ্দ বছর বয়সের একমাত্র ছেলে টনি।'

'ডি কস্টারা কে কি করেন?'

'কাছের বাজারটাতে মি. ডি কস্টার বড় একটা মুদি দোকান আছে। মিসেস ডি কস্টা একটা অ্যাক্সিডেন্টে কয়েক বছর ধরে পঙ্গু। হুইল চেয়ার ছাড়া চলতে ফিরতে পারেন না। ওঁদের ছেলেটা এবার ক্লাস নাইনে। বেশ নির্ঝঞ্ঝাট পরিবার। কারো সাতে-পাঁচে নেই।'

'ঝি,মালী কিংবা ডি কস্টাদের কাউকে কি আপনার সন্দেহ হয়?'

'মি. ডি কস্টা আমাকে নিজের মেয়ের মতই স্নেহ করেন। বাবার সাথে এক সঙ্গে কাজও করেছেন। এ ছাড়া বুয়া কিংবা মালী আমার কোনো ক্ষতি করতে পারে, একথা ভাবতেও কষ্ট হয়।'

'আত্মীয়দের কেউই এখানে থাকে না। চট্টগ্রামে এক মামাতো ভাই আছে। অ্যালবার্ট। পেশায় উকিল। এ ছাড়া একমাত্র চাচাতো বোন এলি, সে-ও থাকে চট্টগ্রামেই। ওখানকার এক কিণ্ডারগার্টেন স্কুলে চাকরি করে।'

'আর আপনার বন্ধু-বান্ধবরা?"

'তাদের প্রায় সবাই এই এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা। কয়েকটা বাড়ি পরেই আমার ঘনিষ্ঠ বান্ধবী রিয়ার বাসা। ওর বাবা কিছুদিন আগে মারা

গেছেন। পৈত্রিক সূত্রে প্রচুর সম্পত্তির মালিক হয়েছে ও। বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু লোকটা একটা আস্ত পিশাচ–তার উপর আবার ড্রাগ অ্যাডিক্ট। তাই শেষ পর্যন্ত টিকলো না বিয়েটা। আমার আরেক বন্ধু ফিরোজ, সে-ও থাকে রিয়ার কাছাকাছিই। পেশায় চিত্রকর। চট্টগ্রামে পেইন্টিংসের একটা দোকান আছে। ওর বাবাই দোকানটা দেখাশোনা করেন। আরও একজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আছে–জাহাজের ক্যাপ্টেন হোবার্ট। চট্টগ্রামে বাড়ি। কিন্তু বেশির ভাগ সময়ই বন্ধু-বান্ধবদের এখানে পড়ে থাকে।'

'এদের কাউকে কি আপনার সন্দেহ হয়?'

'না।'

চিন্তিত দেখাচ্ছে আসাদকে। হ্যাটটা আরও বারকয়েক উল্টেপাল্টে দেখে লিজার দিকে বাড়িয়ে দিল। 'আচ্ছা, আপনার বন্ধু-বান্ধবদের কারোর কি পিস্তল আছে?'

'ঠিক জানি না। তবে মনে হয় না। অবশ্য আমার নিজেরই একটা পিস্তল আছে। জিনিসটা ছিল বাবার। স্মৃতি হিসেবে রেখে দিয়েছি আমি। যদিও কোন কাজেই আসে না...।'

'পিস্তলটা একটু দেখাবেন?'

'অবশ্যই! একটু অপেক্ষা করুন, আমি নিয়ে আসছি,' উঠে চলে গেল লিজা। দোতলার সিঁড়ি ভাঙার শব্দ পেলাম। কয়েক মিনিট পর ফিরে এল ও। চোখমুখ ছাইয়ের মত ফ্যাকাশে। 'পিস্তলটা নেই। ওয়ার্ডরোবের কাপড়ের নীচে রাখা ছিল। গত পরশুও জিনিসটা নজরে পড়েছে আমার।'

দুই

পিস্তল চুরির বিষয়টা জানার পর থেকেই আমাদের আলোচনা নতুন দিকে মোড় নিল। এতক্ষণ মনে হচ্ছিল আসাদ বুঝি খামকাই ভয় পাইয়ে দিচ্ছে লিজাকে। আর লিজাও বোধহয় ওর কথাগুলোকে একেবারে উড়িয়ে না দিলেও খুব একটা গুরুত্ব দিচ্ছিল না। কিন্তু এখন রীতিমত নার্ভাস দেখাচ্ছে ওকে।

'আততায়ী যে অতিশয় চালাক তাতে কোন সন্দেহ নেই। পিস্তলে নিশ্চয়ই আপনার হাতের ছাপ থেকে থাকবে। আর একটা পিস্তল দিয়ে আপনাকে খুন করে আপনার পিস্তলটা যদি আশপাশে কোথাও ফেলে রাখা যায় তা হলে জিনিসটা নিশ্চয়ই কারো না কারো নজরে পড়বে। ধরে নিই, সে পুলিশে খবর দেবে। আর পুলিশ পিস্তলের গায়ে পাওয়া ছাপ পরীক্ষা করে যখন জানবে যে সেটাতে আপনারই হাতের ছাপ তখন ব্যাপারটাকে আত্মহত্যা বলেই ধরে নেবে তারা। পরিকল্পনা মাফিক ঠিকই এগোচ্ছিল আততায়ী কিন্তু কিছুতেই খুন করার জুতসই জায়গা পাচ্ছিল না সে। নইলে আজ আমাদের সামনে সরাসরি হামলা করতে সাহস পেত না। কাজটা সে করেছে অনেকটা মরিয়া হয়ে। যে কোন কারণেই হোক, খুব বেশি সময় নষ্ট করতে রাজি নয় সে। আর তাই খুনকে দুর্ঘটনা কিংবা আত্মহত্যার রূপ দেয়ার চেষ্টা না করে আজ সে সরাসরি হামলা চালিয়েছে।'

'আশ্চর্য! আমার মত সাধারণ একজন মেয়েকে খুন করার জন্য আততায়ী আমারই পিস্তল চুরি করবে–ঝুঁকিটা একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে না?'

'তা হয়তো একটা হচ্ছে। কিন্তু ঐ যে বললাম, আততায়ীর আগেকার পরিকল্পনা ছিল অন্য রকম। আর সে ক্ষেত্রে আপনার পিস্তল চুরি করা ছাড়া অন্য কোন পথ খোলা ছিল না,' সিগারেট কেস থেকে একটা সিগারেট বের করে তাতে অগ্নি সংযোগ করল আসাদ, 'যাক, আপনি ঘাবড়াবেন না।

ঘটনার সঙ্গে আমরা একবার যখন জড়িয়ে পড়েইছি তখন এর শেষ না দেখে ছাড়ছি না। আততায়ী চারবার ব্যর্থ হয়েছে। আগামীতে হয়তো আরও শক্ত হামলা আসতে পারে। তাই আমরা আপনাকে চোখেচোখে তো রাখবই, আপনি নিজেও এখন থেকে খুব সাবধানে থাকবেন।'

'তা তো বুঝলাম, কিন্তু কিভাবে সাবধান হব, একদিন বাইরে না বেরুলেই দম বন্ধ হয়ে আসতে চায় আমার... ।'

'না, না বাড়িতে আটক থাকতে হবে না। তাতে বরং আততায়ী সতর্ক হয়ে যাবে। তখন তাকে ফাঁদ ফেলা কঠিন হয়ে পড়বে। তাই নিরাপদ দূরত্বে থেকে আততায়ীকে সুযোগ করে দিতে হবে। আপনার চলাফেরায় কোন বিধি নিষেধ নেই। কেবল চোখকান একটু খোলা রাখতে হবে।'

'তা কি করতে হবে আমাকে, বলুন?'

'তেমন কিছুই না। যদি সম্ভব হয় তা হলে আপনার কোন আততায়ীকে কয়েক দিনের জন্য এখানে এসে থাকতে বলুন। আমি চাই, রাতের বেলা অন্তত কেউ একজন আপনার কাছাকাছি থাকুক।'

চিন্তিত দেখাচ্ছে লিজাকে। মনে হচ্ছে, কিছু একটা ভাবছে । চুপচাপ কেটে গেল কয়েক মুহূর্ত। 'ইয়ে...মানে আত্মীয়দের মধ্যে ধারেকাছে তো এমন কাউকে দেখছি না যাকে কয়েকদিন এ বাড়িতে থাকার কথা বলতে পারি। অবশ্য রিয়াকে বলা যেতে পারে; কিন্তু নিজের বাড়িঘর ফেলে এখানে এসে আমাকে পাহারা দেয়া বোধহয় ওর পক্ষে সম্ভব হবে না। বরং এক কাজ করা যায়, চট্টগ্রামে আমার যে চাচাতো বোন থাকে ওকে বললে মনে হয় রাজি হবে।'

'বেশ তো, তা হলে ওকেই টেলিফোন করে দিন জলদি এখানে চলে আসার জন্যে। ও হ্যাঁ, আর একটা কথা। আপনার চাচাতো বোনকে আমার পরামর্শেই যে এখানে আসতে বলেছেন একথা কেউ যেন না জানে। এ ছাড়া ওকে এখানে আসতে বলার পেছনে সত্যিকারের উদ্দেশ্যটা গোপন রাখতে হবে।'

'বেশ। তাই হবে।'

'এবারে অন্য একটা প্রসঙ্গে আসি। আপনি কি কখনো উইল করেছিলেন?'

'হ্যাঁ। আট নয় মাস আগে। পেটে টিউমার হয়েছিল। ওটা অপারেশন করানোর সময় উইলটা করেছিলাম। যারা অপারেশনের সময় কাছে ছিল তাদেরই চাপাচাপিতে করেছিলাম ওটা।'

'উইলে কাকে কি দিয়েছিলেন?'

'আসলে উইল করার মত সম্পত্তি কীই বা আছে আমার! বাড়িটা অ্যালবার্টের নামে আর বাদবাকি যা-কিছু সব রিয়ার নামে লিখে দিয়েছিলাম।'

ঘড়ি দেখল আসাদ। রাত প্রায় ন'টা। উঠে দাঁড়ালাম আমরা। ড্রইংরুম থেকে বেরিয়ে আসব, এমন সময় আসাদের নজর গেল দেয়ালে টাঙানো বিরাট অয়েল-পেইন্টিংটার দিকে। সুঠামদেহী এক সুপুরুষের জ্যান্ত প্রতিকৃতি যেন! 'ছবিটা কার?'

'ওটা আমার দাদার। ফিরোজ বেশ কয়েকবার কিনতে চেয়েছে। যদিও টাকাপয়সার টানাটানি, তবু বেচতে ইচ্ছে হয়নি ওটা।'

'ছবিটার জন্য ফিরোজ কত টাকা দিতে চেয়েছিল?'

'পাঁচ হাজার। কিন্তু তবু বুড়ো খোকার স্মৃতিটাকে হাতছাড়া করতে মন সায় দেয় না।'

'এটাই স্বাভাবিক। তো চলি আজকের মত। কোন জরুরি দরকার পড়লে টেলিফোন করে জানাতে দ্বিধা করবেন না।'

পায়ে হাঁটা পথ ধরে হোটেলের কাছাকাছি যখন পৌঁছলাম, রাত তখন প্রায় দশটা।

রাতের খাবার সেরে বিছানায় যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছিলাম। আসাদকে কিছুটা চিন্তিত দেখাচ্ছে। 'চুপচাপ কি ভাবছ এত, তোমার কি মনে হয় আততায়ী আজ রাতেই আবার হামলা চালাবে?'

'অসম্ভব কিছু নয়, কিন্তু আমি ভাবছি অন্য কথা,' দৈনিক জনবার্তা'র কপিটা বাড়িয়ে দিয়ে একটা খবরের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল আসাদ।

খবরটা খুব ছোট. কিন্তু বক্স করে দেয়াতে সহজেই চোখে পড়ে। খবরটা এরকমঃ বিখ্যাত শখের গোয়েন্দা আসাদ রহমান ও তার বন্ধু এবং সহকারী হাবিব আখন্দ বর্তমানে এ শহরে। তাদের এখানে আসার কারণ সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত।

আসাদের দিকে বাড়িয়ে দিলাম জনবার্তা-টা। 'যেভাবে ছেপেছে তাতে যে কারুরই, এমনকী লিজার আততায়ীরও চোখে পড়ার কথা। সে এখন সতর্ক হয়ে পা ফেলবে।'

'আর তাতে করে আততায়ীকে ফাঁদে ফেলাও কঠিন হয়ে পড়বে।'

'তা ঠিক। এখন একটা কথার জবাব দাও তো? তুমি শুধু শুধু কেন লিজার চাচাতো বোনকে টেলিফোন করতে বললে, বরং উচিত ছিল পুলিশ

পাহারা বসিয়ে দেয়া।'

মুচকি হাসল আসাদ। 'পুলিশ পাহারা বসিয়ে কিছু দিনের জন্য হয়তো বা লিজাকে বিপদমুক্ত রাখা সম্ভব। কিন্তু অনির্দিষ্ট কালের জন্য সেটা সম্ভব নয়। তোমার কথামত যদি পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা করা হয় তা হলে হবে কি, যতদিন পুলিশ পাহারা থাকবে আততায়ীও ততদিন ঘাপটি মেরে আশপাশেই কোথাও সুযোগের অপেক্ষায় থাকবে। কারণ সে জানে, একদিন পুলিশ পাহারা উঠে যাবেই। আর সে জানে যে আমরাও এখানে বেশি দিনের জন্য থাকতে আসিনি,' হাই তুলল ও, 'চলো এবার শুয়ে পড়া যাক, বিকেল থেকে তো কম ধকল গেল না,' বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল আসাদ, সেই সঙ্গে আমিও।

পরদিন একটু দেরিতেই ঘুম ভাঙল। উঠে ঘড়ি দেখলাম, সাড়ে ন'টা। আসাদ অনেকক্ষণ আগেই ঘুম থেকে উঠেছে বলে মনে হলো। ইজি চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে চোখ বন্ধ করে সিগারেট টানছে। আমার ওঠার শব্দ পেয়ে আড়চোখে চাইল একবার। তারপর আবার আগের মত চোখ বন্ধ করে ধোঁয়া ছাড়তে লাগল। হাতমুখ ধুয়ে রুম সার্ভিসকে নাশতা আনতে বললাম। বেশ খিদে পেয়েছিল। তাই ডাবল ডিমের ওমলেট, চার স্লাইস মাখন-জেলি লাগানো রুটি আর দুটো বড় সাগর কলা কয়েক মিনিটেই উধাও হয়ে গেল। এবার আয়েশ করে চায়ে চুমুক দিলাম। 'আজ কি কাজ আমাদের?'

আমার কথায় যেন তন্দ্রাভঙ্গ হলো আসাদের। 'প্রথমে লিজার বন্ধু-বান্ধবদের একটু বাজিয়ে দেখা দরকার। এরপর আরও কয়েকটা কাজ আছে, পথে যেতে যেতে বলব।'

কাপড়চোপড় পরে তৈরি হয়ে নিলাম। প্রথমে রিয়ার সঙ্গে দেখা করব।

হোটেল থেকে রিয়ার বাড়িতে হেঁটে যেতে সময় লাগল প্রায় বিশ মিনিট। বাইরে থেকে বাড়িটা বেশ বড় বলে মনে হলো। কলিং বেল টিপতেই অল্পবয়সী একটা কাজের মেয়ে বেরিয়ে এল। আমরা নিজেদের পরিচয় দিয়ে রিয়াকে ডেকে দিতে বললাম। ড্রইংরুমে আমাদের বসিয়ে ভেতরে চলে গেল সে।

একটু পর পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের একটা মেয়ে ঘরে ঢুকে সালাম জানাল আমাদের। বুঝতে কষ্ট হলো না, এরই নাম রিয়া। আসাদ সংক্ষেপে নিজের পরিচয় দিয়ে, আমাকে পরিচয় করিয়ে চট্ করে কাজের কথায় চলে গেল। 'আমরা ঢাকা থেকে কয়েকদিন আগে এসেছি। একটা বিশেষ জরুরি প্রয়োজনে আপনার কাছে আসতে হয়েছে।'

স্পষ্ট বিরক্তি প্রকাশ পেল মেয়েটার চেহারায়। কিন্তু সেটা মুখে প্রকাশ না করে বলল, 'আপনাদের নাম এর আগে কখনো শুনেছি বলে মনে পড়ছে না। ভেবেই পাচ্ছি না, আমার মত সাধারণ এক মেয়ের কাছে আপনাদের কি দরকার থাকতে পারে,' আড়চোখে হাতঘড়ির দিকে একবার তাকাল রিয়া।

'ব্যাপারটা খুব সিরিয়াস। আপনি যদি দয়া করে আমাদের একটু সময় দেন...,' রিয়ার তড়িঘড়ি ভাব দেখে একটু যেন বিরক্তই হলো আসাদ।

আসাদের কথায় এবারে যেন লজ্জা পেয়ে গেল রিয়া। 'কোন তাড়া নেই আমার। আপনারা সুস্থির হয়ে বসুন। যা বলার ধীরে-সুস্থে বললেই হবে। তার আগে চায়ের কথা বলে আসি,' উঠে গেল সে।

রিয়াকে মোটামুটি সুন্দরীই বলা যায়। হালকা ছিপছিপে গড়ন। গায়ের রং বেশ ফর্সা। চোখ দুটোতে সম্মোহনী দৃষ্টি। কথাবার্তায়ও বেশ চটপটে। একটু পর ফিরে এল ও। পেছন পেছন চায়ের ট্রে হাতে কাজের মেয়েটাও ঢুকল। আমাদের দিকে চায়ের কাপ বাড়িয়ে দিল ও। 'এবার বলুন তো, কি এমন জরুরি কথা?'

একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিল আসাদ। 'তা হলে গোড়া থেকেই আরম্ভ করি। কাল বিকেলে আপনার বান্ধবী লিজার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। হোটেলের লনে বসে আলাপ করছিলাম আমরা। সে সময় কেউ একজন ওকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে। ভাগ্য খুবই ভাল বলতে হবে, গুলিটা ওর মাথায় না লেগে হ্যাট ফুটো করে বেরিয়ে গেছে।'

বিস্ময়ে দু-চোখ যেন কপালে উঠল রিয়ার। 'বলেন কি! এবার তা হলে সত্যি সত্যিই হামলা হয়েছে? নাকি এটাও গুলগপ্পো?'

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল আসাদ। রিয়ার শেষ কথাটায় বোধহয় একটু বিরক্তই হয়েছে সে। 'পিস্তল থেকে ছোঁড়া গুলিটা লনের ঘাসের মধ্যে খুঁজে পেয়েছি আমি। কোন সন্দেহ নেই, ঐগুলিটাই লিজার হ্যাট ফুটো করে বেরিয়ে গেছে।'

'আপনি কি নিশ্চিত?'

'হাণ্ড্রেড পার্সেন্ট। গুলিটা আততায়ীই ছুঁড়েছে। লিজার কপাল ভাল। এবারেও বেঁচে গেছে।'

'কিন্তু কেন ওকে কেউ খুন করতে চাইছে–আততায়ীর অন্তত একটা মোটিভ তো থাকা চাই! অগাধ টাকা-পয়সা কিংবা প্রচুর সম্পত্তি–কোনটাই নেই ওর।'

'কিন্তু তবু ওর উপর হামলা হয়েছে–এবং আমাদের উপস্থিতিতেই

হয়েছে সেটা।'

'আপনি যা-ই বলুন না কেন, আজগুবি গল্প ফাঁদতে জুড়ি নেই লিজার। বেশ ক'দিন আগে, হঠাৎ সাত সকালে বাসায় এসে হাজির। বলে কিনা, মাথার কাছে টাঙানো অয়েল-পেইন্টিংটার কর্ড ছিঁড়ে সেটা নাকি পড়তে যাচ্ছিল ওর মাথায়। নেহায়েত বরাতজোরে বেঁচে গিয়েছে। এ ঘটনার কয়েকদিন পর আবার শুনলাম, ও সী-বীচের দিকে যাচ্ছিল, এমন সময় টিলা থেকে কে নাকি একটা বড় পাথরের চাঁই গড়িয়ে দিয়েছিল ওর দিকে। ভাগ্য ভাল যে, সেটা গায়ে লাগতে লাগতেও লাগেনি। দিন চার-পাঁচেক আগের ঘটনাটা আরও মজার। ওর গাড়ির ব্রেক নষ্ট করে রেখেছিল কেউ। এতে প্রায় অ্যাক্সিডেন্ট হতে হতে নাকি বেঁচে গিয়েছে ও। আর আজ শুনলাম এই হ্যাট সমাচার।'

'তার মানে, সত্যি সত্যিই যে এ ঘটনাগুলো ঘটেছে, সে কথা বিশ্বাস হচ্ছে না, আপনার?'

'আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসে কিছু এসে যায় না। তবে লিজার কোন কথা পুরোপুরি বিশ্বাস করা কঠিন। সাদামাঠা কোন ঘটনা ও এমনভাবে রঙ চড়িয়ে বলে যে শুনলে মনে হবে যেন সাংঘাতিক কিছু। এই ঘটনাগুলোর কথাই ধরুন না: চার-চারটে হামলা হয়ে গেল অথচ ওর গায়ে আঁচড়টাও লাগল না!'

'ভাগ্য ওর সহায় ছিল, তাই প্রতিবারই বেঁচে গিয়েছে। কিন্তু তাই বলে ওকে মিথ্যেবাদী বলাটা বোধহয় ঠিক নয়। আর কাল যা ঘটল তার সাক্ষী তো আমি নিজেই।'

'যাকগে। এখন বলুন এ ব্যাপারে আমি কি সাহায্য করতে পারি?'

'আপনি তো লিজার ঘনিষ্ঠ বান্ধবীদের একজন। গুলির ব্যাপারটায় আপনার কি কাউকে সন্দেহ হয়?'

'উহুঁ; আমি তো ভেবেই পাচ্ছি না ওকে খুন করতে যাবে কে, আর তাতে লাভই বা কি?'

'অনেক সময় বৈষয়িক লাভ-লোকসান ছাড়াও একজন আরেকজনকে খুন করতে পারে। সে ক্ষেত্রে মোটিভ হিসেবে বিভিন্ন মনস্তাত্ত্বিক কারণ দাঁড় করানো হয় যেমন, প্রতিহিংসা, প্রেম, ঈর্ষা ইত্যাদি...।'

'এ ক্ষেত্রে তেমন কিছু থেকে থাকলেও আমার তা জানা নেই।'

'আচ্ছা, লিজার কি কারো সঙ্গে বিশেষ কোন সম্পর্ক আছে?'

'ওকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জনের সঙ্গে ঘুরতে দেখা যেত। কখনো ক্যাপ্টেন হোবার্টের সঙ্গে, কখনো বা রবার্টের সঙ্গে। এ ছাড়া মাঝেমধ্যে

চট্টগ্রাম থেকেও কেউ কেউ এসে আড্ডা জমাত। বলতে গেলে বাড়িতে ও একা। এ ছাড়া নেই কোন অভিভাবক। সুতরাং বুঝতেই পারছেন...।'

বেশ বুঝতে পারছি, রিয়ার ইঙ্গিতপূর্ণ কথাগুলো পছন্দ হচ্ছে না আসাদের। তবু মনের ভাব মুখে প্রকাশ না করে আগের কথার খেই ধরল সে, 'আপনি যে দুজনের কথা বললেন তার মধ্যে হোবার্টের নাম আগেই শুনেছি, কিন্তু এই রবার্টটা কে?'

'কাগজে ওর নাম দেখেননি? ও-ই তো গ্লাইডারে চেপে বঙ্গোপসাগরে চক্কর দিতে গিয়ে নিখোঁজ হয়েছে। বাবা নেই। কোটিপতি দাদার কাছেই মানুষ। সেই দাদাও মারা গেছেন অল্প কিছুদিন আগে।'

'যাক এবারে অন্য কথায় আসি। এ বাড়িতে কি আপনি একলাই থাকেন?'

'হ্যাঁ, অনেকটা তাই। একটা কাজের মেয়ে আছে। আর আছে দারোয়ান। বাবা মারা গেছেন বছর দুয়েক আগে। কাঠের ব্যবসা ছিল ওঁর। পৈত্রিকসূত্রে পেয়েছি এই বাড়িটা আর সেই সঙ্গে কয়েক লক্ষ টাকা ব্যাংক ব্যালেন্স। মোটামুটি সচ্ছলভাবেই চলে যায়।'

'এতবড় বাড়িতে একা থাকতে ভয় লাগে না?'

'না। ছেলেবেলা থেকেই এভাবে একা থাকতে অভ্যস্ত আমি। মা মারা গেছেন সেই ছেলেবেলায়। আর বাবাও ব্যবসার কাজে ভীষণ ব্যস্ত থাকতেন। আমাকে বেশিরভাগ সময়েই থাকতে হত বুয়ার কাছে। একটু বড় হয়ে একা একা থাকতে শিখলাম। আর তখন থেকেই ভয়-ডরটা একটু কম আমার।'

'ভাল কথা, নিরাপত্তার জন্য আপনি কি বাড়িতে পিস্তল কিংবা অন্য কোন আগ্নেয়াস্ত্র রাখেন?'

'না, তো!' একটু যেন অবাকই হয়েছে রিয়া।

'আপনার জানামতে এই এলাকায় কারো কি পিস্তল কিংবা রিভলবার আছে?'

'লিজার একটা পিস্তল আছে, শুনেছি। এ ছাড়া আর কারো কোন আগ্নেয়াস্ত্র আছে কিনা, ঠিক জানা নেই আমার। কিন্তু এসব কথা কেন জানতে চাইছেন, বলুন তো?'

'কাল লিজার বাসায় গিয়েছিলাম। কথায় কথায় জানলাম ওর একটা পিস্তল আছে। জিনিসটা দেখতে চাইলাম। কিন্তু পিস্তলটা যেখানে রাখা ছিল সেখান থেকে জিনিসটা বেমালুম গায়েব! অথচ পিস্তলটা দিন দুয়েক আগেও নাকি যথাস্থানে ছিল।'

'আপনার কি ধারণা আততায়ী ঐ পিস্তল দিয়েই লিজাকে গুলি করেছে?'

'অসম্ভব কিছু নয়। আজ তা হলে উঠি। ও হ্যাঁ, আরেকটা কথা। যদি সম্ভব হয় লিজার দিকে একটু লক্ষ্য রাখবেন।'

'বেশ। চেষ্টা করব।'

রিয়ার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা আবার লিজার বাড়ির দিকে রওনা হলাম। মি. ও মিসেস ডি কস্টার সাথে দেখা করতে হবে।

লিজার বাড়ির পেছন দিকটায় তিনটে আধাপাকা ঘর নিয়ে ডি কস্টারা থাকেন। আমরা বাড়ির পেছন দিকটায় যাবো ভাবছি, এমন সময় লম্বামত একজন লোক এগিয়ে এল আমাদের দিকে। কোনরকম ভণিতা না করে লোকটাকে জিজ্ঞেস করল আসাদ, 'আচ্ছা, এখানে মি. ডি কস্টার বাসা কোন্‌টা বলতে পারেন?'

'আমিই যোসেফ ডি কস্টা। কি প্রয়োজন বলুন তো?'

'ইয়ে...আমার নাম আসাদ রহমান। শখের গোয়েন্দা। আর ও হাবিব আখন্দ, আমার বন্ধু। একটা বিশেষ প্রয়োজনে আপনার কাছে এসেছি।'

'আপনিই আসাদ রহমান?' যেন বিশ্বাস হতে চাইছে না যোসেফের, 'কী সৌভাগ্য আমার! পত্র-পত্রিকায় অনেক পড়েছি আপনার কথা। কিন্তু এভাবে চাক্ষুস দেখা হয়ে যাবে তা ভাবিনি কখনো। চলুন, বাসার দিকে যাওয়া যাক।'

বাসার কাছাকাছি পৌঁছে আমাদের দাঁড় করিয়ে রেখে ভেতরে ঢুকল যোসেফ। হঠাৎ কেউ শিস দিল। একটু পর আরও একবার শিসের শব্দ শোনা গেল। দু-তিন মিনিট পর ফিরে এল যোসেফ। আমাদেরকে সঙ্গে নিয়ে বাসার ভেতরে ঢুকল। ড্রইংরুমে ঢুকতেই হুইল চেয়ারে বসা এক মহিলার সঙ্গে চোখাচোখি হলো। যোসেফ পরিচয় করিয়ে দিল, 'মিলি, ইনি হচ্ছেন এ দেশের শ্রেষ্ঠ ডিটেকটিভ আসাদ রহমান। আর উনি ওঁর বন্ধু হাবিব আখন্দ।'

'আপনার অদ্ভুত সব রহস্যভেদের কথা অনেক পড়েছি পত্র-পত্রিকায়। কী সৌভাগ্য! সেই মানুষটির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল আজ,' কণ্ঠে একরাশ উচ্ছ্বাস মিলির।

খুচরো আলাপ জমাতে জুড়ি নেই আসাদের। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই বেশ জমিয়ে ফেলেছে মিলির সঙ্গে। 'আপনার এই দুর্ঘটনাটা ঘটেছিল কবে?'

'প্রায় বছর দুয়েক আগে,' বোধহয় অজান্তেই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল

মিলি, 'চিটাগাং থেকে নাইট কোচে ঢাকা যাচ্ছিলাম। আমাদের বাসটা একটা ট্রাকের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়েছিল প্রায় বিশ ফুট গভীর একটা খাদে। ওই অ্যাক্সিডেন্টে মারা পড়েছিল প্রায় দশ-বারো জন। আমি প্রাণে বাঁচলাম ঠিকই কিন্তু জন্মের মত পঙ্গু হয়ে গেলাম। কয়েকজন বিশেষজ্ঞকেও দেখিয়েছি। বিদেশে নাকি এর চিকিৎসা সম্ভব। কিন্তু আমাদের বিদেশ যাবার মত সামর্থ্য কোথায়?'

ছোট একটা কাজের মেয়ে ট্রে-তে করে চা নিয়ে এল। সাথে বিস্কুট। চায়ের কাপে চুমুক দেয়ার ফাঁকে ফাঁকে যোসেফের সঙ্গে কথা বলছে আসাদ। আমি ভাবছি মিলির কথা। ভদ্রমহিলার বয়স কতই বা, বড়জোর চল্লিশ। শরীর-স্বাস্থ্যও ভাল। শুধুমাত্র এই অ্যাক্সিডেন্টের জন্যেই বাকি জীবনটা হয়তো হুইল চেয়ারকে অবলম্বন করেই কাটাতে হবে ওর–ভাবতেও কষ্ট হয়।

এদিকে কথায় কথায় লিজার প্রসঙ্গ তুলল আসাদ। 'আচ্ছা, গত কিছুদিনের মধ্যে পরপর তিনটে দুর্ঘটনা ঘটেছিল লিজার। এ ব্যাপারে আপনারা কি কিছু জানেন?'

'হ্যাঁ, লিজার কাছে শুনেছি,' বলল যোসেফ।

'আমার মনে হয়, ওগুলো স্রেফ দুর্ঘটনা নয়, লিজাকে খুন করার প্রচেষ্টাও হতে পারে।'

'বলছেন কি আপনি?'

'হ্যাঁ, তাই,' কাল বিকেলের ঘটনাটা খুলে বলল আসাদ।

চোখ বড়বড় হয়ে গেল যোসেফের। 'তা হলে তো এখন থেকেই লিজার সাবধান হয়ে যাওয়া উচিত।'

'এ ব্যাপারে ভবিষ্যতে আপনাদের সাহায্য দরকার হবে। আপাতত লিজার দিকে একটু লক্ষ্য রাখবেন।'

'বেশ। কিন্তু ব্যাপারটার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না। কেউ হঠাৎ করে লিজাকে খুন করতে চাইবে কেন?'

'আমারও সেই একই প্রশ্ন। আচ্ছা, একটা কথা বলুন তো, লিজার কি কারো সঙ্গে প্রেম-ট্রেম আছে?'

'ঠিক জানি না,' বলল যোসেফ।

'জানি না বললেই হলো!' ফুঁসে উঠল মিলি, 'আজ এর সঙ্গে কাল ওর সঙ্গে তো ঘুরছেই। মাঝে মধ্যে আবার চট্টগ্রাম থেকে কেউ কেউ এসে রাত কাটিয়ে...।'

'চুপ করো তুমি,' ধমক দিয়ে মিলিকে থামিয়ে দিল যোসেফ।

দুজনের কথা কাটাকাটির মাঝখানে আবার জিজ্ঞেস করল আসাদ, 'অপারেশনের আগেও নাকি একটা উইল করেছিল?'

'হ্যাঁ, আমরাই এ ব্যাপারে পরামর্শ দিয়েছিলাম। অপারেশনের ব্যাপার, বলা তো যায় না?'

ডি কস্টাদের ধন্যবাদ জানিয়ে তখনকার মত বিদায় নিয়ে চলে এলাম আমরা। রাস্তায় হাঁটছি দুজন। টুকটাক কথাবার্তাও চলছে। 'ডি কস্টাদের তোমার কাছে কেমন মনে হলো?'

'ভালই তো। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই বেশ অমায়িক। ছিমছাম পরিবার। কেন, তুমি ওদের মধ্যেও সন্দেহ করার মত কিছু পেলে নাকি?'

'ওদের বাসায় ঢোকার আগে দু-বার শিসের শব্দ ভেসে এসেছিল।'

'কি হয়েছে তাতে? সবকিছুতেই সন্দেহ করার একটা বাতিক আছে তোমার।'

ঠোঁটের কোণে মুচকি হাসির রেখা খেলে গেল আসাদের। 'বাতিক বলো, আর যা-ই বলো, ওদের ওখানে কিছু একটা ব্যাপার আছে। আমি কিন্তু বিপদের গন্ধ পাচ্ছি, হাবিব। হিসেবে ভুল না হয়ে থাকলে আগামী দু-তিন দিনের মধ্যে অঘটন একটা ঘটবেই।'

'সে যখন ঘটবে তখন দেখা যাবে। এখন চলো, থানা থেকে একটা চক্কর দিয়ে আসি,' ওর ডান হাতটা নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে তাড়াতাড়ি থানায় উদ্দেশে হাঁটতে লাগলাম।

তিন

কক্সবাজার থানার ইন্সপেক্টর জাফর তালুকদার আমাদের পুরনো বন্ধু। আমরা রুমে ঢুকতেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ও। 'আরে! কি সৌভাগ্য আমার! এ যে দেখছি মণি আর কাঞ্চন একই সঙ্গে,' দুজনকে দু-হাতে জড়িয়ে ধরল ও।

'তোমার সঙ্গে দেখা হলেই পুরনো দিনের কথা মনে পড়ে যায়,' বলল আসাদ।

'আমার কিন্তু আরও বেশি করে মনে পড়ে তোমার সেই অদ্ভুত সব রহস্যভেদের কথা। যাকগে, এখন কি জন্য এসেছো তাই বলো। স্রেফ হাওয়া বদল, নাকি এখানেও আবার...।'

'ঢেকি স্বর্গে গিয়েও ধান ভানে,' হাসতে হাসতে বললাম।

কপালে চিন্তার রেখা ফুটে উঠল জাফরের। 'কেন, অঘটন কিছু ঘটেছে নাকি কোথাও?'

ঘটনার আগাগোড়া জাফরকে খুলে বলল আসাদ।

সব কথা শুনে কয়েক মুহূর্ত কি যেন ভাবল জাফর। 'তা হলে এক কাজ করা যেতে পারে। লিজার বাড়িতে পুলিশ পাহারা বসিয়ে দিই।'

'না, এতে করে আততায়ী সতর্ক হয়ে যাবে।'

'তা হলে কি করতে চাও, তুমি?'

'আমি চাই,' বলল আসাদ, 'আততায়ীকে আপাতদৃষ্টিতে সহজ সুযোগ করে দিতে। নইলে তাকে পাকড়াও করা সহজ হবে না। লিজার চাচাতো বোন আজকালের মধ্যে এসে পড়বে। তখন ও-ই পাহারা দেয়ার দায়িত্বটা নেবে। তার আগে পর্যন্ত ওকে সতর্ক হয়ে চলাফেরা করার জন্য বলেছি।'

'কিন্তু ব্যাপারটায় ঝুঁকি একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে না?'

'আমার তা মনে হয় না। কারণ, দেখো, আততায়ীর প্রতিটি প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবার পর তার পরবর্তী প্রচেষ্টার মধ্যে তিন-চার দিনের গ্যাপ আছে।

আর এর কারণটাও খুব সহজ। একটা পরিকল্পনা ভেস্তে যাবার পর আরেকটা তৈরি করতে সময় লাগছে।'

'হুঁ; তা হলে এখন কি করতে পারি আমরা?'

'চুপচাপ চোখ কান খোলা রাখা ছাড়া আপাতত আর কিছুই করার নেই আমাদের।'

'আচ্ছা, তুমি যে সবার কাছেই কালকের ঘটনাটা বলে বেড়াচ্ছো, এটা কি ঠিক হচ্ছে?' এবারে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'আততায়ীকে তাড়াতাড়ি আঘাত হানার জন্য উসকে দিতে হবে। ঘটনাটা যত বেশি জানাজানি হচ্ছে, আততায়ীর পক্ষে নিরিবিলিতে কাজ সারা ঠিক ততই কঠিন হয়ে পড়ছে। আমি একরকম নিশ্চিত, আগামী দুই-এক দিনের মধ্যে আততায়ী তার নতুন পরিকল্পনা কার্যকর করার চেষ্টা চালাবে। আর হ্যাঁ, যেহেতু ঘটনার সঙ্গে আমরা জড়িয়ে পড়েছি তাই তাড়াতাড়ি এর সমাধান করতে হবে। কারণ ঢাকার কাজকর্ম ফেলে রেখে খুব বেশিদিন এখানে থাকা কিছুতেই আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না।'

'বেশ, তুমি যা ভাল মনে করো তাই হবে। কিন্তু সেক্ষেত্রে আমাদের করনীয় কি হওয়া উচিত?' জিজ্ঞেস করল জাফর।

'সন্দেহজনক সবার সঙ্গে পরিচিত হওয়া এবং যাদের ওপর সন্দেহটা বেশি পড়বে তাদের চোখে চোখে রাখা। কিন্তু আমাদের একটা কথা মনে রাখতে হবে। এখন পর্যন্ত সত্যিকার অর্থে কোন অঘটন ঘটেনি। তাই লোকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে খেপিয়ে তোলা চলবে না।'

'ঠিকই বলেছো; তা হলে এখন কি করতে চাও?'

'ভাবছি দুপুরের খাওয়া সেরে চট্টগ্রাম যাব। কপাল ভাল হলে সেখানে আমাদের এক "বন্ধু"র সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে। জাফর, তোমার জীপটা কি পাওয়া যাবে?'

আসাদের কথায় সম্মতি জানাল জাফর। ওকে জোর করে সঙ্গে নিয়ে হোটেলে ফিরে এলাম আমরা। খেলাম তিনজন একসঙ্গে। আসাদের পীড়াপীড়িতে আমাদের সাথে চট্টগ্রাম যেতে রাজি হলো জাফর।

চট্টগ্রামে পৌঁছতে পৌঁছতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। লিজার মামাতো ভাই অ্যালবার্টকে পাওয়া গেল ওর অফিসেই। আসাদ নিজের ভিজিটিং কার্ডটা ভেতরে পাঠিয়ে দেয়ার মিনিট দুয়েক পর ডাক পড়ল আমাদের।

চট্টগ্রাম আসার পথে কথায় কথায় আসাদ বলল, এখানে আসার মূল কারণ লিজার মামাতো ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করা।

অ্যালবার্টের অফিস রুমে ঢুকলাম আমরা। সৌজন্য বিনিময়ের পর চট্ করে কাজের কথায় চলে গেল আসাদ। কালকের সমস্ত ঘটনা খুলে বলল ওকে।

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর মুখ খুলল অ্যালবার্ট, 'এভাবে একলা না থাকার জন্য লিজাকে অনেকবার বকাঝকা করেছি। কিন্তু কে কার কথা শোনে!'

'এ ব্যাপারে আপনার কি কাউকে সন্দেহ হয়?'

'না, আসলে পুরো ব্যাপারটাই আমার কাছে কেমন যেন আজগুবি মনে হচ্ছে।'

'কাল এ ঘটনার পর টেলিফোনে আপনার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু লাইন পাইনি। হাজার হোক কাছের অভিভাবক বলতে আপনি ছাড়া আর তো কেউ নেই ওর।'

'কাল বিকেলে জরুরি একটা কাজে বাইরে যেতে হয়েছিল। ওখান থেকে অফিসে না ফিরে সোজা বাসায় চলে গিয়েছিলাম। যাক, ঘটনা সত্যি-মিথ্যে যা-ই হোক না কেন, আমি আজকালের মধ্যে অবশ্যই লিজার ওখানে যাব।'

কাল সারাদিন আসাদ আর আমি তো একসঙ্গেই ছিলাম। কই, অ্যালবার্টকে টেলিফোন করার কথা তো শুনিনি! ডাহা গুল!

এতক্ষণ ওদের কথা চুপচাপ শুনে যাচ্ছিল জাফর। এবারে মুখ খুলল সে, 'আমার কাছে পুরো ব্যাপারটাই কেমন যেন গোলমেলে ঠেকছে, আসাদ,' অ্যালবার্টের দিকে চেয়ে গম্ভীরভাবে বলল, 'চট্টগ্রাম ছেড়ে অন্য কোথাও গেলে আমাদের জানিয়ে তবে যাবেন।'

উঠে পড়লাম আমরা। অ্যালবার্ট আমাদের জীপ পর্যন্ত এগিয়ে দিল ঠিকই, কিন্তু চেহারায় আগের সেই হাসিখুশি ভাবটা নেই। কিছুটা যেন চিন্তিতও মনে হচ্ছে ওকে। জীপ স্টার্ট নেয়ার মুহূর্তে জিজ্ঞেস করল ও, 'লিজার আততায়ী হিসেবে আমাকেও কি সন্দেহ করেন নাকি আপনারা?'

'যদি করিই, তা হলে কি খুব অন্যায় হবে? লিজা মারা গেলে আর কারোর কোন লাভ না হলেও আপনার কিন্তু আর্থিক লাভ হবে,' বলল জাফর।

'কিন্তু আমিই যে ওর ওপর হামলা চালিয়েছি এমন কোন প্রমাণ আছে, আপনার হাতে?' চড়া গলায় জিজ্ঞেস করল অ্যালবার্ট।

'প্রমাণ নেই, তবে আপনাকে সন্দেহ করার মত অনেক কারণ আছে।'

'যেমন?' আরও চড়লো অ্যালবার্টের গলা।

'আপাতত একটাই শুনে রাখুন, কাল ঐ ঘটনাটা যখন ঘটে সে সময় আপনি আপনার চেম্বারে ছিলেন না,' গম্ভীর গলায় বলল জাফর। আমাদের দুজনকে টেনে নিয়ে জীপে উঠাল ও। ড্রাইভার স্টার্ট দিল। পেছন ফিরে চাইলাম। অ্যালবার্ট তখনো দাঁড়িয়ে। জাফরের কথায় চেহারাটা ছাইয়ের মত সাদা হয়ে গেছে বেচারার।

'দিলে তো লোকটাকে খামকা ভয় পাইয়ে!'

'একটু শিক্ষা হোক। ব্যাটা এমনিতেই উকিল। তার ওপর কথায় কথায় চোখ পাকাচ্ছিল। গা-টা জ্বলে যাচ্ছিল আমার। তাই দিলাম ঠাণ্ডা করে,' হাসতে হাসতে বলল জাফর।

যদিও নভেম্বর মাস তবু শীতের তীব্রতা তেমন নেই। তবে কুয়াশার জন্য দূরের কোনকিছু স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে না। অসমতল পথের মাঝেমধ্যেই এবড়োথেবড়ো গর্ত। এগুলোর কোন কোনটায় পড়ে গিয়ে আবার লাফিয়ে উঠছে জীপ। সড়ক দুর্ঘটনার জন্য আদর্শ রাস্তা! কিন্তু ড্রাইভারের হাত পাকা এত বিপজ্জনক রাস্তাতেও তীরবেগে ছুটিয়েছে জীপ।

কক্সবাজার যখন পৌঁছলাম রাত তখন প্রায় এগারোটা। জাফর আমাদের হোটেল পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে ফিরে গেল থানায়।

ঘুম থেকে উঠতে বেশ বেলা হয়ে গেল। দুজনেই ঝটপট হাতমুখ ধুয়ে নাশতা সেরে নিলাম। কাপড় পরতে লাগল আর দশ মিনিট। আজ প্রথমেই যেতে হবে রিয়ার বাসায়। কাল রাতে শুতে যাবার আগে প্রোগ্রাম ঠিক করে রেখেছে আসাদ।

হোটেল থেকে বেরিয়ে রিয়ার বাড়ির পথ ধরেছি। সোমবারের সকাল। তাই কক্সবাজারের মত ছোট্ট শহরেও কর্মচাঞ্চল্যের কমতি নেই। পরিষ্কার আকাশ। রোদ উঠেছে তেতেমেতে। তবু সকালবেলার শীতের আমেজটা এখনো পুরোপরি মিলিয়ে যায়নি।

রিয়া বাড়িতেই ছিল। এত তাড়াতাড়ি আমাদের আবার আশা করেনি বোধহয়, চোখমুখ দেখে অন্তত সেরকমই মনে হলো। 'কি ব্যাপার, আসাদ সাহেব, আজ এত সকাল সকাল যে? কোন অঘটন ঘটল নাকি?'

'না, না, অঘটন ঠঘটন কিছু নয়। এদিক দিয়েই যাচ্ছিলাম। ভাবলাম, আপনার সঙ্গে একটু দেখা করে যাই।'

'যাক, তা-ও ভাল। আমি ভেবেছিলাম লিজার ওপর নতুন করে আবার হামলা হলো নাকি! এখন বলুন, কি খাবেন, চা না কফি?'

'এ সময় কফি হলেই বোধহয় বেশি ভাল লাগবে,' বলল আসাদ।

কফি এল। সঙ্গে ঘরে তৈরি কেক। রিয়া বানিয়েছে। ওর কেকের খুব

তারিফ করল আসাদ-যদিও আমার কাছে কেকটা তেমন সুবিধের ঠেকল না। আসাদ কি সত্যিই প্রশংসা করল, নাকি রিয়াকে পটিয়ে কথা বের করার ফন্দি!

যা ভেবেছি, ঠিক তাই। কিছুক্ষণের মধ্যে নানারকম গল্পে মশগুল হয়ে গেল ওরা দুজন। কথা আর তুবড়ি ছুটেছে যেন রিয়ার মুখ দিয়ে। 'আসলে যা-ই বলুন না কেন, লিজার ঐ সমস্ত দুর্ঘটনা-গুলোকে কেমন যেন কাল্পনিক বলে মনে হয়।'

'কিন্তু পিস্তল থেকে গুলি ছোঁড়ার ঘটনাটা তো আরও কাল্পনিক নয়-ব্যাপারটা ঘটেছে আমাদের সামনেই।'

ওদের দুজনের আলাপের ফাঁকে টেবিলে রাখা 'দৈনিক জনবার্তা'টা হাতে নিয়ে চোখ বুলাতে লাগলাম। একটা খবরের ওপর দৃষ্টি আটকে গেল। গ্লাইডারে চেপে রবার্ট সিনহা নামের যে ভদ্রলোক বঙ্গোপসাগরে চক্কর দিতে গিয়ে নিখোঁজ হয়েছেন, এখন পর্যন্ত তার কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। খবরটার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে রিয়াকে জিজ্ঞেস করলাম, 'ভদ্রলোককে আপনিও তো চেনেন?'

'চিনি মানে? খুব ভাল করেই চিনি। কোটিপতির দাদার বাইগুলে নাতি হলে যা হয়। দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াতে আর মেয়ে বন্ধুদের পেছনে টাকা খরচ করতে জুড়ি নেই ওর। মাঝে মধ্যে অদ্ভুত অদ্ভুত সব খেয়াল চাপে ওর মাথায়। একবার একাই কক্সবাজার থেকে তেতুঁলিয়া পর্যন্ত পায়ে হেঁটে গিয়েছিল। কয়েক বছর আগে এক মোটর র‍্যালিতে অংশ নিয়েছিল। ইরান থেকে গাড়ি চালিয়ে কক্সবাজার এসেছিল। তবে এবারের পাগলামিটা ছিল বাড়াবাড়ি রকমের। সবাই বারণ করেছিল। কিন্তু কারো কথায় কান দেয়নি ও...।'

ক্রিং ক্রিং শব্দে কলিং বেল বেজে উঠল। উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিল রিয়া। 'আরে, তোমরা হঠাৎ এ সময়ে!' দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা দুজন আগন্তুককে দেখে কেমন যেন অপ্রস্তুত হয়ে গেল ও। দুজনেরই বয়স হবে ত্রিশের কিছু বেশি। আমাদের দিকে ফিরে লোক দুজনের উদ্দেশে বলল রিয়া, 'পরিচয় করিয়ে দিই, ইনি আসাদ রহমান। উনি ওর বন্ধু, হাবিব আখন্দ। আর এ হচ্ছে আমার বন্ধু ফিরোজ নিজামী, ও হলো ক্যাপ্টেন হোবার্ট।'

পরিচয়-পর্ব শেষ হবার পর আরেক দফা কফি এল। বেশ আলাপ জমে উঠল রিয়ার বন্ধু দুজনের সঙ্গে। লিজার ঘটনাটা এরই মধ্যে বলা হয়ে গেছে। সবকিছু শোনার পর বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠল ওরা। ফিরোজ

বলল, 'কিন্তু পুলিশ পাহারা ছাড়া লিজার একলা থাকা কি ঠিক হচ্ছে।?'

'কিংবা আরেক কাজ করলেও হয়। ওকে কয়েক দিনের জন্য চট্টগ্রামের ওর চাচাতো বোনের কাছে পাঠিয়ে দেয়া যেতে পারে, ' পরামর্শ দিল হোবার্ট।

'আততায়ীকে পাকড়াও করতে হলে তাকে সুযোগ দিতে হবে। তা ছাড়া লিজাকে বাইরে কোথাও পাঠিয়ে দিলে কিছুদিনের জন্য হয়তো নিস্তার পাওয়া যাবে। কিন্তু এতে করে সমস্যার সমাধান হচ্ছে কই? এখানে এলেই যে আমার ওর ওপর হামলা হবে এ আমি হলফ করে বলতে পারি। তাই লিজাকে পাহারা দেয়ার চেয়ে খুনীকে জলদি পাকড়াও করার চেষ্টা করাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ,' বলল আসাদ।

'আপনি কি এ ব্যাপারে কাউকে সন্দেহ করেন?' জিজ্ঞেস করল হোবার্ট।

'না। এখনও তেমন কোন প্রমাণ জোগাড় করতে পারিনি। তবে এটা ঠিক, বাইরের কেউ নয়, আত্মীয়-স্বজন কিংবা বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যেই আততায়ী গা ঢাকা দিয়ে আছে।'

কথার ফাঁকে ওদের দুজনকে খুঁটিয়ে দেখছিলাম। ফিরোজ নিজামীকে প্রথম দেখায় যে কারোর ভাল লাগতে বাধ্য। গায়ের রং ফর্সা। চেহারায় শিশু সুলভ সারল্য। কথাবার্তায় আগাগোড়াই মার্জিত। চট্টগ্রামে পেইন্টিংয়ের একটা দোকান আছে ওর। দোকানটা ও আর ওর বাবা চালায়।

চেহারা ও আচার-ব্যবহারে ফিরোজের সঙ্গে কোন মিলই নেই হোবার্টের। চেহারাটা রুক্ষ। কথাবার্তায় কিছুটা উদ্ধত। ওর বাবা এ-দেশী খৃষ্টান। বিয়ে করেছিল ইংল্যাণ্ডে গিয়ে। কিন্তু বেশিদিন টেকেনি বিয়েটা। ছাড়াছাড়ির পর দেশে ফিরে আসে ওর বাবা। তখন ওর বয়স মাত্র পাঁচ বছর। বাবা মারা গিয়েছে বছর তিনেক আগে। বর্তমানে একটা প্রাইভেট কোম্পানির জাহাজে ক্যাপ্টেন হিসেবে কাজ করছে হোবার্ট। কেন জানি না, ওকে বেশ ভাল লেগে গেল আমার।

এ-কথা সে-কথার পর প্রাসঙ্গিক আলাপে চলে এল আসাদ। 'আচ্ছা, আপনাদের কারও কি পিস্তল কিংবা রিভলবার আছে।?'

'না তো!' কণ্ঠে বিস্ময় প্রকাশ পেল ফিরোজের।

'আমার একটা মাউজার পিস্তল আছে,' একটু কেশে নিয়ে বলতে আরম্ভ করল হোবার্ট, 'জাহাজে মাঝেমধ্যে ওটার দরকার হয়ে পড়ে। অবাধ্য ক্রু-দের বশে আনতে বেশ কাজে দেয় জিনিসটা। এ-ব্যাপারে কোম্পানির

অনুমতি নেয়া আছে।'

'পিস্তলটা কি সঙ্গেই রাখেন সবসময়?'

'হ্যাঁ; দেখুন না!' বুশ শার্টের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে জিনিসটা বের করে আনল হোবার্ট।

কালো রঙের মাউজার। দেখে মনে হয় জিনিসটা নতুন। আসাদ পিস্তলটা নেড়েচেড়ে দেখতে দেখতে বলল, 'আপনার যদি অসুবিধা না হয় তাহলে কয়েকদিনের জন্য পিস্তলটা আমি সঙ্গে রাখতে চাই।'

ভ্রু কুঁচকে গেল হোবার্টের। বোঝা গেল বেশ বিরক্ত হয়েছে ও। তবু ভদ্রতা বজায় রেখে বলল, 'বেশ, কিন্তু কেন, বলুন তো?'

'ঢাকা থেকে আসার সময় ভুলে আমার রিভলবারটা ফেলে এসেছি। আততায়ী জানে, শেষ দেখা না দেখে এখান থেকে নড়ব না আমি। তাই আমার উপরও এক-আধটা হামলা এলে অবাক হবার কিছু থাকবে না। নিরাপত্তার জন্য এটা নিয়ে রাখলাম আপনার কাছ থেকে।'

আসাদের কথায় হোবার্ট আশ্বস্ত হয়েছে বলে মনে হলো। কিন্তু আমি জানি, ডাঁহা গুল মেরেছে আসাদ। আসার সময় নিজহাতে ওর রিভলবারটা ব্রিফকেসে ঢুকিয়েছি। মাউজারটা হাত করার পেছনে নিশ্চয়ই অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে। একটু পর ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে উঠে পড়লাম। বাইরে এসে লিজার বাড়ির উদ্দেশে পা বাড়ালাম আমরা।

দোতলার ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে ছিল লিজা। আমাদের দেখতে পেয়ে দৌড়ে নিচে এসে দরজা খুলে দিল। এই দু'দিনে যেন বয়স কয়েক বছর বেড়ে গিয়েছে ওর। 'কি ব্যাপার! আপনাকে এত শুকনো দেখাচ্ছে কেন?' জিজ্ঞেস করলাম।

'সেদিনের পর থেকে কোনকিছুই ভাল লাগছে না আর। বাইরেও তেমন একটা বেরুইনি। কেবলই ভয় হচ্ছে, আততায়ী এই বুঝি আবার হামলা চালাল!'

'মৃত্যুকে বুঝি ভীষণ ভয় পান আপনি!' হাসতে হাসতে বললাম।

'মৃত্যুকে যত না ভয় পাই, তার চেয়ে বেশি ভয় পাই মৃত্যুর ভয়ে ভীত হয়ে থাকাকে,' দার্শনিকের মত বলল লিজা।

পকেট থেকে হোবার্টের পিস্তলটা বের করে লিজার দিকে বাড়িয়ে ধরল আসাদ, 'দেখুন তো, এটা আপনার সেই পিস্তল কিনা?

'না, আমারটা আরও পুরনো। কোথায় পেলেন এটা?'

সত্যি কথা গোপন করে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল আসাদ, কিন্তু তার আর দরকার পড়ল না। সামান্য দূরে রাখা টেলিফোনটা বেজে উঠল ক্রিং

ক্রিং শব্দে উঠে গিয়ে রিসিভার তুলল লিজা। মিনিট পাঁচেক কথা বলার পর ফিরে এল। 'আমার চাচাতো বোনের টেলিফোন। কাল সকালের মধ্যেই এখানে এসে যাবে ও। ঘটনাটা কি জানার জন্য সেদিনও খুব পীড়াপীড়ি করিছিল। আর আজ তো টেলিফোন ছাড়বেই না। শেষে বাধ্য হয়ে বললাম–তোকে একটা সারপ্রাইজ, দেব, তাই এখন কিছুই বলা যাবে না। ও অবশ্য কিছু একটা আঁচ করেছে বলে মনে হয়। বারবার জিজ্ঞেস করছিল–"তোর কোন বিপদ-আপদ হয়নি তো?"

'আসল কথা গোপন করে ভালই করেছেন। নইলে ভয় পেয়ে যেত ও,' মন্তব্য করল আসাদ।

'ও হ্যাঁ, আর একটা কথা। কাল সন্ধ্যার পর বাসায় ছোটখাটো একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি। আপনারা কিন্তু অবশ্যই আসবেন। উপজাতিদের একটা দল নানারকম শারীরিক কসরত দেখাবে। তারপর আছে বাজি পোড়ানোর খেলা। ডিনার রাত ন'টায়। দাদার আমল থেকেই প্রতি বছর শীতের সময় এই অনুষ্ঠানের রেওয়াজ চলে আসছে। তখন তো শহরসুদ্ধ লোককে দাওয়াত দেয়া হত। আর এখন শুধু মাত্র ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধব আর দু-চারজন প্রতিবেশীকে ডেকে ঐতিহ্য রক্ষা করা আর কি! কাল সন্ধ্যায় অন্য কোথাও আপনাদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেই তো?'

'না, তেমন কোন জরুরি কাজ নেই। আমরা সময় মতই পৌঁছে যাব। আজ তাহলে চলি।' উঠে দাঁড়াল আসাদ। সেই সঙ্গে আমিও।

লিজার বাড়ি ছেড়ে মাত্র কয়েক গজ এগিয়েছি, এমন সময় মাঝবয়সী একজন লোককে আসতে দেখা গেল। সারা শরীর ধুলোবালিতে মাখামাখি। এক হাতে কয়েকটা চারাগাছ, অন্য হাতে ছোট একটা টুকরি। এই লোকটাই বোধহয় লিজার বাগানের মালী। লোকটা কাছাকাছি আসতেই জিজ্ঞেস করল আসাদ, 'এই যে, বুড়া মিয়া, তুমি কি এই বাড়িতে কাজ কর?'

'হ, মালীর কাম করি।'

কথাবার্তায় বোঝা গেল, লোকটা নেহায়েতই সরল। লিজার ঘটনাটা আসাদ কেন ওকে বলতে গেল বুঝলাম না–হয়তো ওর প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য। শুনে চোখ বড়বড় হয়ে গেল ওর। 'ইয়াল্লা, কন কি, ছার! আমার আফামণিরে কেডা খুন করবার চায়...সাহস তো ব্যাডার কম না...!'

লোকটার কথার ফুলঝুরি মাঝপথে থামিয়ে দিল আসাদ, 'গত পরশু বিকেলবেলা তুমি কোথায় কি করছিলে?'

'কি আর করুম,' নোংরা হাত দিয়ে মাথাটা একটু চুলকে নিল লোকটা,

'হেই সময় ফুলগাছে পানি দিবার লাগছিলাম।'

'ঐ সময় তুমি যে সত্যি সত্যিই বাগানে পানি দিচ্ছিলে তার প্রমাণ কি, তখন তোমার সঙ্গে কি কেউ ছিল?'

'হ।'

'তোমার সঙ্গে আর কে ছিল, ঐ সময়?'

'টমি। আফামণির খুব আদরের পোষা কুত্তা।'

বোঝা গেল, লোকটা শুধু সরলই নয়। সেই সঙ্গে মগজেরও কিছু ঘাটতি আছে। আর দেরি না করে হাঁটতে শুরু করলাম আমরা থানার দিকে।

জাফর অফিসেই ছিল। আমাদের দেখে হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করল, 'এভাবে বড়শি ফেলে অপেক্ষা করতে ভাল লাগছে না আর। আচ্ছা, আসাদ, তুমি কি সত্যি মনে কর আততায়ী আবার হামলা চালাবে?'

'শুধু মনেই করি না, আমার স্থির বিশ্বাস, দু-এক দিনের মধ্যেই হামলা চালাবে আততায়ী। ও হ্যাঁ, যে জন্য তোমার কাছে আসা–একটা তালিকা দিচ্ছি। সন্দেহজনক অনেকের নাম আছে এতে। তোমাকে একটু কষ্ট করে বের করতে হবে, গত পরশু বিকেল পাঁচটা থেকে ছ'টার মধ্যে কে কোথায় ছিল,' পকেট থেকে একটা তালিকা বের করে জাফরের দিকে বাড়িয়ে ধরল আসাদ। একনজর দেখলাম সেটা। লিজার বন্ধু-বান্ধবী, পরিচিত ও আত্মীয়-স্বজন প্রায় সবারই নাম রয়েছে এতে।

কাগজটা ভাঁজ করে শার্টের পকেটে রাখল জাফর। 'বেশ, কাল দুপুরের মধ্যেই এটা ফেরত পেয়ে যাবে। এখন বলো, কি খাবে, কফি আর সঙ্গে স্যাণ্ডউইচ, চলবে তো?'

বিনয়ের সঙ্গে ওর আতিথেতা প্রত্যাখ্যান করে হোটেলের দিকে রওনা দিলাম আমরা।

হোটেলে পৌঁছে চট করে গোসল সেরে নিলাম। তারপর খেয়ে-দেয়ে দুজনেই লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লাম বিছানায়।

ঘুম ভাঙল সন্ধ্যের একটু আগে। রুম সার্ভিসকে ডেকে হালকা নাশতা আনিয়ে নিলাম। এরপর এল চা। চা শেষ করে দুজন বেরিয়ে পড়লাম সান্ধ্যভ্রমণে।

সমুদ্রের তীর ঘেঁষে হাঁটছি। উল্টো দিক থেকে হোবার্টকে আসতে দেখা গেল। সঙ্গে একজন লোক। লোকটার হাঁটাচলা দেখে মনে হয় নেশাখোর। আমাদের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই দূর থেকে মুচকি হেসে হাত নাড়ল। কিন্তু কাছে এল না। এড়িয়ে যাবার ভাব লক্ষ্য করলাম হোবার্টের আচরণে।

কথাটা বললাম আসাদকে। ও মাথা নেড়ে সায় দিল, 'দেখে মনে হচ্ছে লোকটা পুরোপুরি ড্রাগ অ্যাডিক্ট। হোবার্ট বেশ বুদ্ধিমান। আমাদের সামনে যাতে কোনরকম অঘটন না ঘটায় তাই লোকটাকে নিয়ে অন্যদিকে কেটে পড়েছে। কিন্তু আমি ভাবছি অন্য কথা.... ।'

'কি?'

'ভাবছি, এত সতর্কতা সত্ত্বেও প্রতি বছর প্রচুর ড্রাগস আসছে আমাদের দেশে। ভেবেই পাই না, এত কড়াকড়ির পরও লক্ষ লক্ষ টাকার হেরোইন কোকেন গাঁজা কিভাবে পাচার হয়ে আমাদের দেশে আসে?

'যে সমস্ত ব্যাপারে বাহ্যিকভাবে আইনের বেশি কড়াকড়ি, সেগুলোতেই ফাঁকি থেকে যায় বেশি।'

সন্ধ্যা নেমেছে বেশ কিছুক্ষণ আগে। তবে দিনের আলোর রেশটুকু একেবারে মিলিয়ে যায়নি। দূরে সমুদ্রের ঢেউগুলো একটার সঙ্গে আরেকটা ধাক্কা খেয়ে খেয়ে গজরাচ্ছে। আর তার উপর চাঁদের আলো পড়ে রেশমী চাদরের মত দেখাচ্ছে। আরও কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটির পর হোটেলের পথ ধরলাম। আমাদের থেকে প্রায় পঞ্চাশ গজ সামনে দুজন পাশাপাশি হেঁটে চলেছে। একজন পুরুষ, অন্যজন মহিলা। জ্যোৎস্না থাকায় দূর থেকেও চিনতে অসুবিধা হলো না–ফিরোজ আর রিয়া।

চার

আসাদের ডাকাডাকিতে ঘুম ভেঙে গেল। ঘড়ি দেখলাম। মাত্র সাড়ে ছ'টা। এত ভোরে বিছানা ছাড়তে কার ইচ্ছে করে? কম্বলটা মাথা পর্যন্ত টেনে দিয়ে ঘাপটি মেরে পড়ে রইলাম। বিছানা ছাড়ছি না দেখে একটু পরে রেডিওর ভলিউম বাড়িয়ে দিয়ে বাথরুমে ঢুকল আসাদ। বেশ কিছুক্ষণ পর সাতটার খবর শুরু হলো। হঠাৎ একটা খবরে কান খাড়া হয়ে গেল আমার। গভীর সমুদ্রে গ্লাইডারের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। কিন্তু রবার্ট সিনহার কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। কর্তৃপক্ষের ধারণা, সমুদ্রেই ডুবে মারা গেছে সে। অনুসন্ধানকারী দলকে ফিরিয়ে নেয়া হয়েছে।

'শেষ পর্যন্ত ডুবেই মারা গেল লোকটা!' চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে মন্তব্য করল আসাদ।

'কিন্তু সেক্ষেত্রে মৃতদেহটা তো খুঁজে পাবার কথা!'

'হয়তো সামুদ্রিক প্রাণীর খোরাক হয়েছে।'

বেলা চড়ছে। উঠে পড়লাম বিছানা ছেড়ে। তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুয়ে নাশতা সেরে বেরিয়ে পড়লাম।

কিছু কেনাকাটা ছিল। সে সব সেরে থানার দিকে রওনা হলাম। ঘড়িতে বেলা প্রায় বারটা। থানায় পৌঁছে দেখি, কি একটা কাজে বাইরে গিয়েছে জাফর। প্রায় আধ ঘণ্টা অপেক্ষার পর জীপের আওয়াজ পাওয়া গেল। রুমে ঢুকে সৌজন্য বিনিময়ের পর কাজের কথায় চলে গেল জাফর। 'তুমি যে ক'জনের নাম দিয়েছো তাদের কারুরই ঐ এক ঘণ্টার কাজকর্মে সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যায়নি। তবু যদি শুনতে চাও তাহলে বলি।'

'বেশ, বলো,' চেয়ারে গা এলিয়ে দেয়ার মত করে বসে একটা সিগারেট ধরাল আসাদ।

'লিজার বাড়ির লোকজন দিয়েই শুরু করা যাক। ওর বাড়ির কাজের মেয়ে ঐ সময় রাতের রান্নার প্রস্তুতি শেষ করে নামাজের জন্য তৈরি

হচ্ছিল। ওর স্বামী বাগানের আগাছা সাফ করছিল। মি. ডি কষ্টা ঐদিন সন্ধ্যার আগে বাড়ি ছেড়ে কোথাও বেরোননি। আর মিসেস ডি কষ্টা তো আমাদের তালিকার বাইরেই থাকছেন। রিয়া ঐদিন বিকেলে সী-বীচে বেড়াতে গিয়েছিল। সঙ্গে ফিরোজ আর হোবার্টও ছিল। সন্ধ্যা পর্যন্ত একসাথে বেড়ানোর পর যে যার মত ফিরে এসেছিল। এছাড়া অ্যালবার্টের অ্যালিবাইটাও পরীক্ষা করে দেখেছি কিন্তু সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যায়নি। কেস সংক্রান্ত ব্যাপারে এক মক্কেলের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। সেখান থেকে সোজা বাসায়।'

'তার মানে,' একটু যেন হতাশ হলো আসাদ, 'আমরা বোধহয় ভুল পথে এগোচ্ছি।'

'আমারও তাই মনে হয়। শুধু একটা ব্যাপারই তলিয়ে দেখ না! লোকে কেন খুন করতে যাবে লিজাকে? ধনসম্পত্তি তেমন কিছুই নেই মেয়েটার। উপরন্তু বাড়িটাও বন্ধক দেয়া তাই এ ব্যাপারে প্রথমত আর্থিক দিকটাকে সহজেই আমরা বাদ দিতে পারি। এছাড়া প্রেম, হিংসা কিংবা ব্যক্তিগত শত্রুতা–এক্ষেত্রে এগুলোর কোনটাকেই খুনের জন্যে জোরাল মোটিভ বলে মনে হয় না। অবশ্য যে ঘটনাটা তোমাদের চোখের সামনে ঘটেছে সেটাকে একেবারে উড়িয়ে দিচ্ছি না আমি। কোন কাণ্ড হতে পারে সেটা।'

একটু চিন্তিত দেখাচ্ছে আসাদকে। 'হয়তো তোমার কথাই ঠিক। তবু আরও দু–একদিন অপেক্ষা করে দেখতে চাই। আমার কেন যেন মনে হচ্ছে, কিছু একটা ঘটবেই।'

'তোমার অনুমান বড় একটা ভুল হতে দেখিনি কখনও। এবারেও আশ্চর্যরকমভাবে মিলে গেলে অবাক হব না মোটেও।'

চা খেয়ে উঠে পড়লাম আমরা। হোটেলে ফেরার পথে কোন কথা হলো না আসাদের সঙ্গে। কেমন যেন গম্ভীর দেখাচ্ছে ওকে।

সন্ধ্যার পরপরই লিজার ওখানে পৌঁছে গেলাম। মেহমানদের তেমন কেউ তখনও এসে পৌঁছেনি। দুপুরবেলা চট্টগ্রাম থেকে ওর চাচাতো বোন এলি এসেছে। ওর সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিল লিজা। চালচলন আর কথাবার্তায় লিজার সঙ্গে কোন মিল খুঁজে পেলাম না ওর। একটা ছাই রঙের শাড়িতে বেশ মানিয়েছে ওকে। খোঁপায় বেলী ফুলের মালা। কথাবার্তায় যেমন ভদ্র তেমনি আচার-ব্যবহারেও মার্জিত। চটকদার সুন্দরী না হলেও এমন একটা স্নিগ্ধ সৌন্দর্য আছে মেয়েটার যা সহজেই অন্যকে আকৃষ্ট করে। বাবাকে ও হারিয়েছে যখন বয়স সাত কি আট। এরপর কক্সবাজারে

দাদার বাড়িতে ও আর লিজা একসঙ্গে বড় হয়েছে। দাদা মারা যাবার পর ও চট্টগ্রামে মা'র সঙ্গে থাকছে। এতে অবশ্য দুজনের বন্ধুত্ব কোনরকম ছেদ পড়েনি। বছরের বিভিন্ন ছুটিছাটায় এখানে বেড়াতে আসে ও। আর লিজাও মাঝেমধ্যে চট্টগ্রামে গিয়ে ওর ওখান থেকে বেড়িয়ে আসে।

আসাদ এরই মধ্যে আলাপ জমিয়ে নিয়েছে এলির সঙ্গে। কথায় কথায় জিজ্ঞেস করল এলি, 'এখানে এসে শুনতে পেলাম, লিজাকে নাকি কয়েকবার খুন করার চেষ্টা হয়েছে, কথাটা কি সত্যি?'

'হ্যাঁ। তবে এ ব্যাপারে এখনও নিশ্চিত করে কিছু বলা যাচ্ছে না। ওগুলো খুনের চেষ্টাও হতে পারে কিংবা স্রেফ দুর্ঘটনাও হতে পারে।'

'দুর্ঘটনাই যেন হয়।' অস্ফুট কণ্ঠস্বর এলির, 'তবু কেমন যেন অমঙ্গলের পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছি আমি। মনে হচ্ছে, এ বাড়িতে কোথাও কিছু একটা ঘটতে চলেছে। কোন বিপদ–আপদ ঘটার আগে আমি ঠিক ঠিকই টের পেয়ে যাই। মনে হয়, লিজার আরও সাবধান হওয়া উচিত।'

'এ ক্ষেত্রে খুব বেশি সাবধান হবার তেমন একটা সুযোগ নেই। আততায়ী নিত্য–নতুন কৌশল খাটাচ্ছে। আর তাই তাকে পাকড়াও করতে হলে আঘাত এড়িয়ে যাবার চেয়ে আঘাতের মুখোমুখি হওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। আপনি শুধু ওর ব্যাপারে চোখ কান একটু খোলা রাখবেন। কোন কিছু খটকা লাগলে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের তা জানাতে ভুলবেন না কিন্তু!'

কপালে চিন্তার রেখা ফুটে উঠল এলির। 'এখানে এসে সবকিছু শোনার পর মাকে একটা চিঠি লিখেছি যেন মানসিকভাবে তৈরি থাকে। আপনি বললে এখানে আসার জন্য টেলিফোন করে দিতে পারি।'

'না, না, তার কোন প্রয়োজন হবে না। আপনি তো থাকছেনই। আর আমরাও ওর ওপর নজর রেখে চলেছি। এছাড়া স্থানীয় পুলিশ কর্মকর্তাকেও জানিয়ে রেখেছি।'

দূর থেকে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র আর ঢোলের আওয়াজ ভেসে আসছে। একটু একটু করে নিকটবর্তী হচ্ছে আওয়াজটা। উপজাতিদের দলটা এসে পৌঁছেছে। বিচিত্র তাদের বেশভূষা। মাথায় পাখির পালক, কানে নানারকম ধাতুর তৈরি অলঙ্কার আর পরনে লুঙ্গির মত পেঁচানো কাপড়। কারও কারও শরীরের বিভিন্ন জায়গায় উলকি আঁকা। বাড়ির সামনের খোলা জায়গাটায় গোল হয়ে বসে পড়ল ওরা।

একে একে রিয়া, ফিরোজ আর হোবার্ট এল। এর একটু পর এল মি. ডি কস্টা। লিজা ওদের অভ্যর্থনা জানিয়ে ভেতরে চলে গেল রান্নাবান্নার

তদারক করতে। ও দিকে উপজাতিদের নাচ শুরু হয়েছে। কি বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি! নানারকম বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজে কান ঝালাপালা হবার যোগাড়। একটু পর অ্যালবার্টকে ঢুকতে দেখা গেল। চট্টগ্রাম থেকে নিজেই ড্রাইভ করে এসেছে।

ঘণ্টাখানেক পর নাচের পর্ব শেষ হলো। একটু পর বাজি পোড়ানোর খেলা শুরু হবে। দেখতে সুবিধে হবে বলে চেয়ারগুলো বের করে বাড়ির সামনের খোলা জায়গায় পেতে দেয়া হলো। এদিকে রাত বাড়ার সাথে সাথে শীতও বাড়ছে। এলি গরম কাপড় গায়ে দেয়নি। শীতে জড়োসড়ো হয়ে এক কোণে বসে আছে। লিজা ওকে লক্ষ্য করেছে। বলল, 'ওপরে গিয়ে আমার ওয়ার্ডরোবের প্রথম তাকে দেখবি কালো একটা শাল। ওটা গায়ে দে গিয়ে।'

অন্য পাশ থেকে চেঁচিয়ে উঠল রিয়া, 'এলি, লিজার রুমে আমার ওভারকোটটা আছে। ওটা একটু এনে দেবে, প্লিজ!'

উঠে গেল এলি। একটু পর বুয়া এসে লিজাকে ডাক দিল। কালো রঙের শাড়িতে চমৎকার মানিয়েছে লিজাকে। গায়ে দামী কালো পশমী শাল। অতিথি আর রান্নাঘর দু-দিকেই সমানভাবে সামলাচ্ছে ও। কিন্তু আজ সন্ধ্যা থেকেই কেমন যেন অস্থির দেখাচ্ছে ওকে। চোখেমুখে দুশ্চিন্তার ছাপ...। প্রচণ্ড শব্দ করে বিস্ফোরিত হলো একটা হাউই। প্রথমে লাল, তারপর নীল, হলুদ এবং সবশেষে সবুজ রঙের আবীর ছড়িয়ে মিলিয়ে গেল সেটা আকাশে।

লিজা রান্নাঘর থেকে এক চক্কর দিয়ে এসে আবারও কিছুক্ষণের জন্য ভিতরে গিয়েছিল ফোন ধরতে। এখন আবার আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। আতসবাজিগুলো একেকটা একেক রকমের। কোনটা নানারকম রঙ ছড়িয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। কোনটা আবার বিভিন্ন রকমের নক্সা তৈরি করছে। রঙধনুর মত সাত রঙের বাহার ছড়াচ্ছে কোনকোনটা। কিছুক্ষণের মধ্যে বাজি পোড়ানো শেষ হবে। এদিকে ভীষণ শীত করছে আমার। ডিনারের আরও প্রায় আধ ঘণ্টা দেরি। আসাদকে বললাম। ওরও একই অবস্থা। বেরোনোর সময় কেন গরম কাপড় সঙ্গে নিইনি, সেজন্য নিজের উপরই রাগ হচ্ছে আমার। ফিসফিস করে আসাদকে বললাম, 'চল, চট্ করে হোটেল থেকে গরম কাপড়গুলো নিয়ে আসি। নইলে শীতে জমে মরতে হবে।'

বাড়ির সামনের গেট জুড়ে উপজাতিদের দলটা গোল হয়ে বসে আছে। তাই বাড়ির পেছন দিকে যে গেটটা, আমরা সেদিকেই হাঁটতে শুরু

করলাম। ওঠার সময় লিজার চোখাচোখি হয়ে গেল। কথাটা খুলে বললাম ওকে। মুচকি হেসে সম্মতি জানাল ও। আর কেউ লক্ষ্য করল না আমাদের। পেছনে খানিকটা খোলা জায়গা। তারপর গেট। গেটের কাছাকাছি চলে এসেছি, এমন সময় বিশ-পঁচিশ গজ দূরের একটা জিনিসের ওপর দৃষ্টি আটকে গেল আমার। মনে হচ্ছে, কেউ শুয়ে আছে ওখানটায়। অন্ধকারে ভাল করে দেখাও যাচ্ছে না। দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেলাম আমরা।

কালো শাল জড়িয়ে থাকা দেহটাকে চিনতে কষ্ট হলো না-এলি। হাঁটু গেড়ে বসে ওর কপালে হাত রাখল আসাদ। পর মুহূর্তের সরিয়ে আনল হাতটা। 'ও আর বেঁচে নেই, হাবিব!'

লক্ষ্য করলাম, বুকের কাছটা রক্তে ভিজে রয়েছে। খুব সম্ভবত বুকেই গুলি করেছে আততায়ী।

যেন বোবা বনে গেছে আসাদ। কিছুক্ষণ কোন কথাই বলতে পারল না ও। একদৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে এলির নিথর দেহটার দিকে। আরও কিছুক্ষণ পর কথা ফুটল আসাদের মুখে, 'এলির মৃত্যুর জন্য যদি কেউ দায়ী হয়ে তবে সে একমাত্র আমি। বেচারিকে আমার পরামর্শেই এখানে আনা হয়েছিল। আর তাই মরতে হলো ওকে...' বাষ্পরুদ্ধ হয়ে এল আসাদের কণ্ঠস্বর।

আমাদের কথাবার্তার আওয়াজ আরও কেউ কেউ শুনে থাকবে বোধহয়। একটু পর ফিরোজ আর হোবার্টকে দেখা গেল আসতে। কাছে এসে যখন দেখাতে পেল এলি পড়ে রয়েছে মাটিতে তখন দুজনেই বিকট চিৎকারে আশপাশে কাঁপিয়ে তুলল প্রায়। আসাদ ওদের দুজনকে একরকম ধমক দিয়ে চুপ করাল। ওদিকে লিজাকেও আসতে দেখা গেল। ওকে আসতে দেখে এগিয়ে গেল আসাদ। কাঁপাকাঁপা গলায় বলল, 'দারুণ একটা দুঃসংবাদ সবার জন্য অপেক্ষা করছে, লিজা... ।'

'কি? কারো কোন দুর্ঘটনা...' দৃষ্টি চলে গেল একটু দূরে পড়ে থাকা এলির দিকে। ছুটে গিয়ে হাত ধরে ঝাঁকুনি দিতেই বুঝতে পারল, কি হয়েছে। হঠাৎ অপ্রকৃতিস্থের মত হেসে উঠল ও-ঠিক যেন হিস্টেরিয়ার রোগী। আমাদের সবাইকে অবাক করে দিয়ে আচমকা জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল লিজা।

ঘটনাটা ততক্ষণে জানাজানি হয়ে গেছে। চারপাশে ভিড় জমাচ্ছে সবাই। কেউ যেন মৃতদেহ স্পর্শ না করে সেজন্য অ্যালবার্টকে ওখানে বসিয়ে রেখে আমরা কয়েকজন লিজাকে ধরাধরি করে ড্রইং রুমে নিয়ে এলাম। কিছুক্ষণ পর জ্ঞান ফিরে এল লিজার। এই ফাঁকে জাফর আর

স্থানীয় ডাক্তার লতিফ শিকদারকে টেলিফোন করে ঘটনাটা জানানো হয়েছে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই এসে পড়বে ওরা।

জ্ঞান ফিরে পেয়ে অঝোর ধারায় কেঁদে চলেছে লিজা। কিছুতেই থামানো যাচ্ছে না। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলতে লাগল, 'আমি...এই আমিই যত নষ্টের মূল। নইলে আমাকে পাহারা দিতে এসে কেন মরতে হবে ওকে...।'

ভয় হচ্ছিল, যেভাবে কান্নাকাটি করছে তাতে আবার না জ্ঞান হারিয়ে ফেলে! ওর মাথায় হাত রাখল আসাদ। স্নেহের সুরে বলল, 'লিজা, এ ঘটনার জন্য দোষ যদি কাউকে দিতেই হয় তবে সে একমাত্র আমি। আমার কথাতেই ওকে এখানে আসতে বলেছিলেন আপনি। আততায়ীকে ধরতে তো পারলামই না, উপরন্তু আমার অসাবধানতার জন্য প্রাণ দিতে হলো বেচারিকে।'

'কিন্তু কেন? আততায়ী কেন খুন করল ওকে? খুন তো হবার কথা আমার। আমাকে রক্ষা করতে এসে নিজের প্রাণ দিয়ে গেল! উহ্, ভাবতে পারছি না আর...'আবারও ফুঁপিয়ে উঠল লিজা। সান্ত্বনা দেয়ার কোন ভাষা খুঁজে পেলাম না।

বাইরে হর্ন শোনা গেল। জাফরের জীপ। একটু পর লতিফ শিকদারকে আসতে দেখা গেল। লিজাকে বুয়ার জিম্মায় রেখে ওদের দুজনকে এলির মৃতদেহের কাছে নিয়ে গেলাম। ডাক্তার শিকদার লাশ পরীক্ষা করে বললেন, 'বড়জোর ঘণ্টাখানেক আগে মৃত্যু হয়েছে ওর।'

দেহটাকে জাফরও ভালভাবে পরখ করল। কোন সূত্র পেল কিনা কে জানে! আমাদের সঙ্গে চোখাচোখি হলো ওর। তারপর পোস্ট মর্টেমের জন্য লাশ সরিয়ে নিতে নির্দেশ দিল কনস্টেবলদের।

আমরা আবার ড্রইংরুমে এসে বসলাম। ততক্ষণে লিজা খানিকটা স্বাভাবিক হয়েছে বলে মনে হলো। জাফর আর আসাদ নিজেদের মধ্যে কি যেন ইঙ্গিত বিনিময় করল। তারপর জাফরই কথা শুরু করল, 'এর আগেও তো আপনার উপর হামলা হয়েছিল, তাই না?'

'হ্যাঁ,' ছোট্ট করে জবাব দিল লিজা।

জাফর বিস্তারিত শুনতে চাইল না। আমাদের কাছ থেকে ওগুলো আগেই শুনেছে ও। 'এ ব্যাপারে আপনার কি কাউকে সন্দেহ হয়?'

'না। আত্মীয়-স্বজন কিংবা বন্ধু-বান্ধব সবার সঙ্গেই আমার সম্পর্ক ভাল। এদের কেউ এ কাজ করতে পারে বলে বিশ্বাস হয় না। তা ছাড়া বাইরের কেউ কেনই বা আমাকে খুন করতে চাইবে?'

'হুঁ,' চিন্তিত দেখাচ্ছে জাফরকে, 'আচ্ছা, আজ রাতে এলির সঙ্গে

আপনার শেষ কখন দেখা হয়?'

'প্রায় আটটার দিকে। শীতে ঠকঠক করে কাঁপছিল। তাই দেখে আমি বললাম, দোতলায় গিয়ে ওয়ার্ডরোব খুলে আমার শালটা বের করে নিয়ে গায়ে দিতে। রিয়ার ওভারকোটটাও ওখানেই রাখা ছিল। ওখান থেকে ওভারকোটটা ওকে এনে দিতে বলেছিল রিয়া। ও ওপরে যাবার পর ওর সঙ্গে আর দেখা হয়নি আমার।'

'ও ঠিক ঠিকই শালটা খুঁজে পেল কিনা তা খোঁজ নেননি?'

'আসলে রান্নার তদারকি নিয়ে এতই ব্যস্ত ছিলাম যে কথাটা পরে আর মনেই হয়নি আমার।'

'স্বাভাবিক,' আসাদের দিকে ফিরল জাফর, 'মনে হচ্ছে,এলির মৃত্যুর ব্যাপারটা আততায়ীর ভুলের ফল। আততায়ী এলিকে লিজা ভেবে গুলি করেছে। এ রকম ভুল হবার কারণ, দুজনেরই পরনে কালো পোশাক। তুমি কি বলো, আসাদ?'

'হুঁ, আমারও তাই মনে হচ্ছে।'

'উহ্, কি ভয়ানক...' দুহাতে মুখ ঢেকে আবার কান্নায় ভেঙে পড়ল লিজা। ওকে কাছে টেনে নিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিল রিয়া। তবু অনুতাপে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে ও। এই দুর্ঘটনার জন্য নিজেকেই দোষী ঠাওরাচ্ছে। রিয়ার কাঁধে মাথা রেখে নিজেকে সোফায় এলিয়ে দিল লিজা। চোখদুটো বোজা। আবার জ্ঞান হারিয়ে ফেলল কিনা কে জানে। ডাক্তার শিকদারও মনে মনে বোধহয় এই আশঙ্কাই করছিলেন। কিন্তু পরীক্ষা করে বললেন, 'না, ও জ্ঞান হারায়নি। একটু তন্দ্রার ভাব হয়েছে।'

ফিসফিস করে আসাদের সঙ্গে কি যেন আলাপ করল জাফর। তারপর ডাক্তার শিকদারকে বলল, 'আচ্ছা, লিজাকে কয়েকদিনের জন্য কোন নার্সিং হোমে ভর্তি করিয়ে দিলে কেমন হয়? বেচারির যা অবস্থা তাতে পুরোপুরি বিশ্রামের প্রয়োজন। কিন্তু বাড়িতে থাকলে লোকজনের ভিড় লেগেই থাকবে।'

'আমিও এই একই কথা বলতে চাচ্ছিলাম,' সায় দিলেন ডাক্তার, 'এ ধরনের ঘটনা থেকে অনেক সময় মানসিক বিকারের সৃষ্টি হয়। সে জন্য পরিপূর্ণ বিশ্রামের বিশেষ প্রয়োজন। শর্মিলা নার্সিং হোমের সঙ্গে আমার ভাল জানাশোনা আছে। আপনারা বললে ওখানে ওর ভর্তির ব্যবস্থা করে দিতে পারি।'

'বেশ, তাই করুন।'

সবরকম আধুনিক সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায় এরকম নার্সিং হোম

গোটা কক্সবাজারে মাত্র দুটো কি তিনটে। শর্মিলা নার্সিং হোম এগুলোরই একটা। ডাক্তার শিকদার টেলিফোন করার দশ মিনিটের মধ্যে অ্যাম্বুলেন্স চলে এল। আমরা কয়েকজন মিলে ধরাধরি করে লিজাকে তুলে দিলাম অ্যাম্বুলেন্সে। সঙ্গে রইলেন ডাক্তার শিকদার। অ্যাম্বুলেন্স ছাড়ার আগে ডাক্তারের উদ্দেশে বলল জাফর, 'ওর সঙ্গে বন্ধু-বান্ধব কিংবা আত্মীয়-স্বজন কেউ যাতে দেখা করতে না পারে, সে ব্যাপারে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য ওদেরকে বিশেষভাবে বলে দেবেন। আর একটা কথা, ওদের নিজস্ব খাবার ছাড়া অন্য কোন বাইরের খাবার লিজাকে যেন না দেয়া হয়।'

অ্যাম্বুলেন্স চলে গেল। আমরাও উঠে পড়লাম জাফরের জীপে। যাবার আগে সবার উদ্দেশে বলল জাফর, 'আপনারা যারা আজ এখানে উপস্থিত ছিলেন তাদের কেউই স্থানীয় থানা কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া কক্সবাজার ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে পারবেন না।'–অতিথিদের মধ্যে মৃদু আপত্তির গুঞ্জন উঠল। চেঁচিয়ে কিছু একটা বলতে চাচ্ছিল অ্যালবার্ট। কিন্তু ততক্ষণে আমাদের জীপ বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছে।

পাঁচ

হোটেলে পৌঁছতে পৌঁছতে রাত প্রায় এগারোটা। খিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে। রুম সার্ভিসকে ডেকে কিছু খাবার আনিয়ে নিলাম। আসাদ খাবারের কিছুই মুখে তুলছে না। এলির মৃত্যুটাকে এখানো সহজভাবে মেনে নিতে পারছে না ও। জানালা দিয়ে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। উঠে গিয়ে কাঁধে হাত রাখলাম ওর। বললাম, 'কেন মিছেমিছি নিজেকে দোষী ঠাওরাচ্ছো? যা হবার হয়েছে। এ নিয়ে মন খারাপ করে লাভ নেই। আমরা তো লিজার উপর দৃষ্টি রেখেই চলেছিলাম। আচমকা যদি অন্য কেউ খুন হয়েই যায় তা হলে কী-ই বা করতে পারি? আমরা তো আর সর্বজ্ঞ নই!'

'তাই বলে তুমি বলতে চাও, আমার চোখের সামনে একজন খুন হয়ে যাবে আর চুপচাপ আমি তা দেখে যাব? আজ লিজার বেঁচে যাওয়াটা অনেকটা দৈবাৎ ঘটনাই বলতে পারো। আততায়ী লিজাকে খুন করতে গিয়ে ভুল করে এলিকে খুন করেছে। এখানে লিজা কিংবা এলির মধ্যে কে খুন হলো সেটা বড় কথা নয়; আসল কথা হলো, আততায়ী আমাদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে সফল হয়েছে। কে জানে, আগামীতে হয়তো সে ভুল না-ও করতে পারে,' চিন্তিত স্বরে বলল আসাদ।

'যা-ই বলো না কেন, লিজার ওপর আঘাত হানা এবারে আর তত সহজ হবে না। চব্বিশ ঘণ্টা ওকে নার্সদের পাহারায় রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ ছাড়া দারোয়ান, বয় চাপরাশী এরা তো আছেই।'

'হয়তো তোমার কথাই ঠিক। কিন্তু এ কথাও ঠিক যে আততায়ী ভীষণ চালাক। নতুন কোন কৌশলে আঘাত সে হানবেই।'

'তার মানে, বলতে চাচ্ছো নার্সিং হোমেও লিজা নিরাপদ নয়?'

'অবশ্যই নিরাপদ। তবু সাবধানের মার নেই। আগের চেয়ে অনেক বেশি সতর্ক হয়ে পা ফেলতে হবে আমাদের। কোনরকম সুযোগ দেয়া চলবে না। এতে করে খুনী আমাদের হাতে ধরা পড়ুক বা না-ই পড়ুক।'

'কিন্তু এভাবে কতদিন? একসময় তো ওকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনতেই হবে।'

'তা ঠিক। কিন্তু কিছুদিনের জন্য হলেও নিরাপদ থাকছে ও। আর আমরাও দম ফেলার ফুরসত পাচ্ছি।'

'তোমার কি মনে হয়, অনুষ্ঠানে যারা উপস্থিত ছিল তাদেরই কেউ খুনটা করেছে? কোন খেপার কাণ্ড নয় তো? কারণ মনে রাখতে হবে, খুন হয়েছে এলি, লিজা নয়।'

'কোন খেপার কাজ নয় এটা, একেবারেই ঠাণ্ডা মাথায় খুন। যারা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল তাদেরই কেউ একজন খুনী-এ ব্যাপারে আমি প্রায় নিশ্চিত। এখানে এলির খুন হওয়াটা দৈবাৎ দুর্ঘটনা মাত্র। আততায়ী এলিকেই লিজা ভেবে গুলি করেছে। দুজনেরই গায়ে কালো শাল থাকায় এমনটা ঘটেছে।'

'আচ্ছা, পিস্তলটা গেল কোথায়?'

'মনে হয় সমুদ্রের পানিতেই ঠাঁই পেয়েছে ওটা।'

'আচ্ছা, খুনের ব্যাপারে তোমার কাকে বেশি সন্দেহ হয়?'

'সবাইকেই,' কেশে গলাটা পরিষ্কার করল আসাদ, 'আচ্ছা, একটু ভেবে বলো তো, অনুষ্ঠানে অতিথিরা কি সারাক্ষণ যে যার আসনে ঠায় বসে থেকেছে? আমি বলব, থাকেনি। প্রায় সবাই কোন না কোন ছুতোয় একবারের জন্য হলেও আসন ছেড়ে উঠেছে।'

'তবু মোটিভের প্রশ্নটা কিন্তু থেকেই যাচ্ছে। লিজাকে খুন করে সবাই তো আর লাভবান হচ্ছে না। আর এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে অ্যালবার্টকেই আমাদের সন্দেহ তালিকায় সবার উপরে স্থান দিতে হয়।'

'রিয়ার ব্যাপারেও সেই একই কথা। অপারেশনের সময় উইলে রিয়ার নামেও সম্পত্তি লিখে দিয়েছিল লিজা'।'

'এ তো গেল সরাসরি আর্থিক লাভের ব্যাপার। এ ছাড়া অন্য কোন মোটিভেও থাকতে পারে। যেমন ধরো, প্রতিহিংসা কিংবা...'

'হ্যাঁ, মোটিভ হিসেবে আরও অনেক কিছুকেই ধরা যেতে পারে,' আমার কথায় বাধা দিয়ে বলল আসাদ, 'যেমন, আমাদের জানতে হবে বাড়িটা বিক্রির কোন প্রস্তাব কারো কাছ থেকে এসেছিল কিনা। বাড়ির মাটির নিচে গুপ্তধন কিংবা ঐ জাতীয় কোন কিছু লুকানো আছে কিনা কে জানে!' হো হো করে হেসে উঠল আসাদ। 'তা ছাড়া জেলাসির কথা বললেও অনেককেই সন্দেহের তালিকায় ধরতে হয়। কারণ, শোনা যায়, লিজার সঙ্গে অনেকেরই প্রেম-প্রেম সম্পর্ক ছিল বা আছে।'

'এমনও তো হতে পারে, লিজা কারো সম্বন্ধে এমন কোন গোপন কথা জানে যা প্রকাশ পেলে ঐ লোককে নাস্তানাবুদ হতে হবে।'

'কি জানি!' আড়মোরা ভেঙে উঠে দাঁড়াল আসাদ। সাইড টেবিলে রাখা রাইটিং প্যাডটা টেনে নিয়ে কি যেন লিখতে শুরু করল। প্রায় ঘণ্টাখানেক কোন কথা না বলে একটানা লিখে গেল। লেখা শেষ হলে পুরোটা একবার পড়ে আমার দিকে বাড়িয়ে দিল ও। কাগজে যা লেখা তা হুবহু এরকমঃ

১. বুয়া
২. বুয়ার স্বামী (বাগানের মালী)
৩. "এক" এবং "দুই" এর নাবালক সন্তান
৪. মি. ডি কস্টা
৫. মিসেস ডি কস্টা
৬. রিয়া
৭. ফিরোজ
৮. হোবার্ট
৯. অ্যালবার্ট
১০। ?

মন্তব্য ঃ

১. বুয়া : অয়েল-পেইন্টিংয়ের কর্ড কাটা কিংবা পাথরের চাঁই গড়িয়ে দেয়ার ব্যাপারে ওর হাত থাকতে পারে। পিস্তল খোয়া যাওয়া কিংবা পিস্তল দিয়ে গুলি করাও ওর পক্ষে অসাধ্য কিছু নয়। তবে গাড়ির ব্রেক অকেজো করার ব্যাপারে ওর হাত না থাকাই স্বাভাবিক। এ কাজ ওর স্তরের কাউকে দিয়ে সম্ভব নয়।

মোটিভ : এখানে আর্থিক লাভছাড়া অন্য যে কোনকিছুই মোটিভ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

টীকা : বুয়া কিংবা বুয়ার কোন আত্মীয়ের সাথে অতীতে লিজার কোনরকম ঝগড়া-বিবাদ হয়েছিল কিনা জানতে হবে।

২. মালী : ১-এর সমস্ত মোটিভ এর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য.।

টীকা : ভালভাবে জেরা করতে হবে।

৩. বুয়া এবং মালীর নাবালক সন্তানঃ মোটিভ বিচার করলে সন্দেহ তালিকার বাইরে রাখা যেতে পারে।

টীকা : ভালভাবে জেরা করতে হবে। মূল্যবান কোন তথ্য বেরিয়ে আসতে পারে।

৪. মি. ডি কস্টা : ওর বাসায় ঢোকার সময় শিসের শব্দ ভেসে

আসছিল। কেন?

মোটিভ : আপাত দৃষ্টিতে কিছুই না।

টীকা : লিজার বাবার সঙ্গে সম্পর্ক কেমন ছিল জানতে হবে।

৫. মিসেস ডি কস্টা : শারীরিকভাবে পঙ্গু। তাই সন্দেহ তালিকার বাইরে রাখা যেতে পারে।

টীকা : ভালভাবে জেরা করতে হবে। মূল্যবান কোন তথ্য জানা যেতে পারে।

৬. রিয়া : লিজার ওপর হালমাগুলোকে বরাবরই ও "বানোয়াট" কিংবা "বাজে কথা" বলে উড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছে। কেন?

মোটিভ : আর্থিক লাভ কিংবা প্রতিহিংসা। কিংবা ভয়? জানার চেষ্টা করতে হবে।

টীকা : ওর ব্যাপারে লিজার সঙ্গে আলাপ করতে হবে। এ ছাড়া ওর বিয়ের ঘটনাটাও পুরোপুরি জানা দরকার।

৭. ফিরোজ : লিজার অয়েল পেইন্টিংগুলো কেনার ব্যাপারে ওর এত আগ্রহ কেন?

মোটিভ : অজ্ঞাত।

টীকা : ফিরোজের বর্তমান ব্যবসার অবস্থার কথা জানতে হবে।

৮. হোবার্ট : আপাতদৃষ্টিতে সন্দেহ করার মত কিছু নেই। তবে বেশ কিছুদিন থেকে এই এলাকায় আছে। তাই লিজার ওপর হামলার ব্যাপারে ওর হাত থাকার সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেয়া যায় না।

মোটিভ : অজ্ঞাত।

টীকা : ভালভাবে জেরা করতে হবে।

৯. অ্যালবার্ট : হোটেলের লনে লিজাকে লক্ষ্য করে যখন গুলি ছোঁড়া হয়, ও তখন অফিসে ছিল না। অবশ্য এ ক্ষেত্রে অ্যালিবাই আছে। তবু তাতে ফাঁক থাকতে পারে।

মোটিভঃ আর্থিক প্রাপ্তিকেই এ ক্ষেত্রে সম্ভাব্য মোটিভ হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

টীকাঃ অ্যালবার্টের বর্তমান আর্থিক অবস্থা কেমন, জানতে হবে। এ ছাড়া ওর অ্যালিবাইটা আর একবার পরীক্ষা করে দেখা দরকার।

১০.? পুরো ঘটনায় একজন দশ নম্বরী, অর্থাৎ বাইরের অপরিচিত কারো হাত থাকতে পারে। সে ক্ষেত্রে উপরের এক কিংবা একাধিকজনের সঙ্গে তার গোপন যোগাযোগ থাকতে পারে। লোকটা (এ ক্ষেত্রে পুরুষ হবার সম্ভাবনা বেশি) পেশাদার খুনী, খেপা কিংবা লিজার গোপন শত্রুও

হতে পারে।

মোটিভ : অজ্ঞাত।

টীকা : পেশাদার খুনী হলে অন্যের হয়ে ভাড়া খাটতে পারে। সে ক্ষেত্রে উপরের যে-কারোর সঙ্গে যোগসাজশ থাকতে পারে। খেপা হলে অবশ্য অন্য কথা। গোপন শত্রুর ব্যাপারে লিজাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে।

'চমৎকার,' কাগজটা ওর হাতে ফিরিয়ে দিলাম, 'কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে আসা যাচ্ছে না। তোমার তালিকাটা পড়লে বোঝা যায়, মোটিভ যার যা-ই থাকুক না কেন, সবার সমান সুযোগ ছিল।'

'তবু, এ ক্ষেত্রে মোটিভ এবং সুযোগ বিচার করলে কাকে তোমার বেশি সন্দেহ হয়?'

'অ্যালবার্টকে। ওর ক্ষেত্রে সুযোগ যা-ই থাকুক না কেন, মোটিভ কিন্তু অত্যন্ত জোরাল।'

আমার কথার কোন জবাব না দিয়ে হঠাৎ কাগজটাকে দুমড়ে মুচড়ে ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে ছুঁড়ে ফেলল আসাদ। কিছু একটা বলতে চাচ্ছিলাম, কিন্তু তার আগেই বাধা দিয়ে বলে উঠল ও, 'আসলে ওটা কিস্‌সু হয়নি। আমার মোটিভ আর সুযোগ নিয়েই এতক্ষণ মাথা ঘামিয়েছি। কিন্তু অপরাধের মনস্তাত্ত্বিক দিকটাই বাদ পড়ে গেছে।'

'মানে?'

'মানে, তুমি এখন শুয়ে পড়ো। আমি আরও কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে মাথাটাকে খেলানোর চেষ্টা করব,' ইজি চেয়ারে গা এলিয়ে দিল আসাদ।

ঘুম আসছে না কিছুতেই। কেবল এপাশ ওপাশ করছি। ইজি চেয়ারে আধশোয়া অবস্থায় সিগারেট টানছে আসাদ। কিছুক্ষণ পর দেখলাম, উঠে গিয়ে ওয়েস্ট পেপার বাস্কেট থেকে কাগজটা তুলে নিল। ওর ঠোঁটের কোণে মুচকি হাসি। এরপর কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছি আমি।

সূর্যের আলো চোখে পড়ায় বিছানা ছেড়ে উঠতে হলো। ঘড়িতে প্রায় সাড়ে আটটা। আসাদকে দেখলাম কাল রাতের মত চোখ বন্ধ করে বসে আছে। চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছে, শেভ গোসল ইত্যাদি সেরে ফেলেছে আগেই। নাশতার ঝামেলাটাও চুকিয়ে ফেলেছে বোধহয়। আমার পায়ের শব্দ পেয়ে আচমকা বলে উঠল, 'আমার তিনটে প্রশ্নের উত্তর আগে দাও। প্রথম প্রশ্ন: ইদানীং লিজাকে দেখলে বুঝতে কষ্ট হয় না, ওর ঘুমের ব্যাঘাত

হচ্ছে–কেন? দুই: সাধারণত ও কালো কাপড় পরে না, কিন্তু কাল রাতে কালো কাপড় পরেছিল কেন? শেষ প্রশ্ন: ও কেন বলেছিল, 'এখন আর বেঁচে থেকে কি লাভ''?'

'কালরাতে লিজার ওখানে আমরা দুজন তো সব সময় এক সাথেই ছিলাম–কখন ও একথা বলল?'

'রান্নাঘর থেকে চক্কর দিয়ে আসার পর। ঐ সময় তুমি বাজি পোড়ানো দেখতেই ব্যস্ত ছিলে। তাই খেয়াল করোনি কথাটা। যাক এবারে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ঝটপট।'

আসাদের কণ্ঠে কৌতুকের সুর থাকলেও বুঝলাম, প্রশ্নগুলো ওকে রীতিমত ভাবিয়ে তুলেছে। 'বেশ, তোমার প্রথম প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে–ইদানীং ও বেশ দুশ্চিন্তার মধ্য দিয়ে দিন কাটাচ্ছে।'

'ঠিক। কিন্তু কেন?'

ওর পাল্টা প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে গিয়ে বললাম, 'আর কালো পোশাকের ব্যাপারে বলা যেতে পারে রুচি বদল। সবাই পোশাক–পরিচ্ছদের ব্যাপারে বৈচিত্র্য পছন্দ করে।'

'দূর! মেয়েদের মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা তোমার খুবই কম। কোন মেয়ে একবার যদি জেনে যায়, অমুক রং তাকে মানায় না, তবে জীবনেও সে ঐ রঙের পোশাক পরবে না। তোমার বোধহয় মনে নেই, একদিন কথায় কথায় লিজা বলেছিল কালো রঙ ওর দু'চোখের বিষ।'

'তোমার শেষ প্রশ্নের উত্তর খুব সহজ। এত বড় একটা দুর্ঘটনার পর...।'

'কিন্তু কথাটা লিজা বলেছিল দুর্ঘটনাটা ঘটবার আগে, পরে নয়,' মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল আসাদ। 'কাল রাতে দুর্ঘটনা ঘটবার আগে ওর সঙ্গে শেষ কখন আমাদের দেখা হয় বলতে পারো?'

'হ্যাঁ, রাত তখন প্রায় আটটা। এ সময় ও উঠে গিয়েছিল রান্নার তদারকি করতে এবং পরের বার গিয়েছিল টেলিফোন ধরতে।'

'ঠিক। টেলিফোন ধরতে গিয়ে প্রায় মিনিট বিশেক অর্থাৎ এলির মৃতদেহ চোখে পড়ার আগ পর্যন্ত ওর দেখা পাওয়া যায়নি। এখন প্রশ্ন হলো, ঐ সময় ও কি সত্যিই কারো সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলছিল, নাকি অন্য কোন ব্যাপারে ব্যস্ত ছিল, আমাদের তা জানতে হবে। আমি প্রায় নিশ্চিত যে, ও কিছু একটা গোপন করে যাচেছ–আর সেটাই হত্যাকারীর মূল মোটিভ কিনা কে জানে!'

গোসল সেরে নাশতা শেষ করেছি, এমন সময় দরজায় টোকা

পড়ল–রিয়া। শুভেচ্ছ বিনিময়ের পর আসাদের খোঁজ করল ও। ব্যালকনি থেকে ডেকে আনলাম ওকে।

'মি. রহমান, কাল রাতের দুর্ঘটনাটা যে লিজার জন্যই ঘটেছে এ ব্যাপারে আপনি কি নিশ্চিত?'

'হ্যাঁ, আততায়ী এলিকেই লিজা ভেবে গুলি করেছে। এতে কোন সন্দেহ নেই।'

'আসলে কি জানেন, কাল দুর্ঘটনাটা ঘটার আগ পর্যন্ত আমার বিশ্বাসই হয়নি, লিজার উপর সত্যি সত্যিই আক্রমণ আসতে যাচেছ। তবে একটা কথা, এ ঘটনার জন্য কিছুটা হলেও ও নিজেই দায়ী। সব সময় একগাদা বয়ফ্রেণ্ড নিয়ে হল্লা আর যার তার সাথে প্রেম প্রেম খেলার পরিণতিই হচ্ছে কালকের এই দুর্ঘটনা।'

'যাক যা হবার হয়েছে। এবারে, রিয়া, আপনার কথা কিছু বলুন তো? দেখা আমাদের বেশ কয়েকবারই হয়েছে কিন্তু তেমন আলাপের সুযোগ হয়নি।'

'কি আর বলব!' একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল রিয়া, 'বিয়ে করেছিলাম ভালবেসে। কিন্তু ভালবাসা দিয়ে সংসার টিকিয়ে রাখতে পারলাম না। নেশাখোর স্বামীর অত্যাচার সইতে না পেরে সংসারের মায়া ছেড়েছুড়ে দিয়ে চলে এসেছি। মাস ছয়েক হলো আইনগতভাবে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে আমাদের।'

'সত্যিই বড় দুঃখজনক ঘটনা। তবু বলব, সামনে বিরাট ভবিষ্যৎ পড়ে রয়েছে আপনার। নতুন করে কাউকে কি বেছে নেয়া যায় না?'

আসাদের কথায় কি যেন একটা ইঙ্গিত ছিল। রক্তিম হয়ে উঠল রিয়ার গালদুটো। 'ফিরোজের সঙ্গে আমার খুবই ভাল সম্পর্ক। জানি না ভবিষ্যতে কি আছে কপাল,' উঠে দাঁড়াল রিয়া। 'একবার লিজাকে দেখতে যেতে হবে। ফুল নিয়ে গেলে আপত্তি নেই তো?'

'মোটেই না। বরং এ সময় কারো কাছ থেকে একগুচ্ছ ফুল উপহার পেলে খুশিই হবে ও। তবে কোন খাবার নেয়া চলবে না।'

সমঝদারের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল রিয়া। ও চলে যাবার পর আসাদ বলল, 'আসলেই দারুণ চালাক মেয়ে এই রিয়া। আকারে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিয়ে গেল ফিরোজের সঙ্গে ওর বিশেষ একটা সম্পর্ক আছে। আর ফিরোজের আর্থিক অবস্থা, ওর কথামত, ভাল। তাই সম্পত্তি কিংবা অন্য কোন কারণে ও যে লিজাকে খুন করতে চাইবে না, সেটাই প্রকাশ পেল ওর কথায়। অথচ ঘটনার শুরু থেকেই সন্দেহ তালিকায় রয়েছে ওর নাম।'

'ওকে নার্সিং হোমে না যেতে দেয়াই ভাল ছিল বোধহয়।'

'সেটা করতে গেলে ও আরও সতর্ক হয়ে যাবে। আর এ নিয়ে ভাবনার কোন কারণ নেই। ওখানকার নার্স কিংবা ডাক্তারদের কেউই লিজার সঙ্গে ওকে দেখা করতে দেবে না।'

রুমে আরেকবার টোকা পড়ল–ক্যাপ্টেন হোবার্ট। ঢুকেই চড়া গলায় জিজ্ঞেস করল, 'এসব কার বুদ্ধি, মি. রহমান? নার্সিং হোমে রীতিমত কথা কাটাকাটি হয়েছে ডাক্তার আর নার্সদের সঙ্গে। ওরা কাউকেই লিজার সঙ্গে দেখা করতে দিচ্ছে না। এই অহেতুক হয়রানির মানে কি?''এই নির্দেশ নিশ্চয়ই ডা. শিকদার দিয়েছেন। রোগীকে নিরাপদে রাখার দায়িত্ব তাঁর।'

'কিন্তু তাই বলে কি লিজার ঘনিষ্ঠ বন্ধু–বান্ধবরাও ওকে দেখতে পাবে না?'

'একটা ব্যাপার কেন বুঝছেন না!' কণ্ঠে বিরক্তি প্রকাশ পেল আসাদের, 'একজনকে অনুমতি দিলে সবাইকেই দিতে হবে। আর সেক্ষেত্রে রোগীর জীবনের উপর হামলা হবার নতুন সুযোগ যেমন সৃষ্টি হচ্ছে, অন্যদিকে মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ারও সম্ভাবনা আছে।'

একটু গজগজ করলেও ঘটনার গুরুত্ব বোধহয় বুঝতে পারল হোবার্ট। 'দেখা না হয় না-ই হলো কিন্তু ফুল কিংবা অন্য কিছু পাঠানো যাবে তো?'

'খাবার জিনিস ছাড়া অন্য কোনকিছুতেই আপত্তি নেই।'

হোবার্ট চলে যাবার পর আমরাও উঠে পড়লাম। হাঁটতে শুরু করলাম নার্সিং হোমের উদ্দেশে।

ছয়

যেতে যেতে কথা হচ্ছিল। বললাম, 'ব্যাপার কি বলো তো? লিজার ওখানে এখন যাচ্ছো, কোন মতলব নেই তো আবার?'

'মতলব অবশ্যই আছে; কিন্তু মনে হয় যা জানার জন্য যাচ্ছি, ইতিমধ্যেই সেটা জানা হয়ে গেছে।'

আমি এ ব্যাপারে আরও কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই সম্পূর্ণ ভিন্ন এক প্রসঙ্গে চলে গেল ও। 'লিজার দাদার অয়েল পেইন্টিংটা বিশেষজ্ঞ দিয়ে পরীক্ষা করিয়েছিলাম। ওটার দাম হাজার দুয়েকের বেশি হবে না।'

'কিন্তু হঠাৎ করে এ ব্যাপারে তুমি এত আগ্রহ দেখাচ্ছো কেন?'

'ফিরোজ ওটা পাঁচ হাজার টাকায় কিনতে চেয়েছিল। ঝানু ব্যবসায়ীরা কোনকিছু কিনতে গেলে ন্যায্য দামের চেয়েও কম বলে। কিন্তু এক্ষেত্রে ফিরোজের বেশি বলার কারণ কি? আর একটা ব্যাপার মাথায় রাখতে হবে; ফিরোজও এই লাইনে একজন বিশেষজ্ঞ।'

নার্সিং হোমের একজন নার্স আমাদের স্বাগত জানাল। সম্ভবত ডা. শিকদার আগেভাগে আমাদের ব্যাপারে ওকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন। 'মিস লিজার রাতের ঘুমটা ভালই হয়েছিল,' দোতলায় ওঠার সময় বলল ও।

লিজার কেবিনে ঢুকলাম। দোতলার একেবারে কোণের দিককার কেবিনে–ছিমছাম এবং নিরিবিলি। আমাদের দেখতে পেয়ে মলিন হাসি ফুটে উঠল ওর চেহারায়। আসাদের জিজ্ঞাসু দৃষ্টির প্রত্যুত্তরে দার্শনিকের মত ও বলল, 'এখনো বেঁচে আছি। তবে আগামী দিনগুলোর কথা জানি না। ঈশ্বরই জানেন, এই সুন্দর পৃথিবীতে আমার আয়ু আর কতক্ষণ–মাস, দিন না ঘণ্টা!'

'অতটা ভেঙে পড়লে চলবে কেন?' স্নেহের সুর আসাদের কণ্ঠে কয়েক মুহূর্ত কারো মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুলো না। নীরবতা ভঙ্গ করল

আসাদই। 'লিজা, একটা কথা সত্যি করে বলবেন? বিষয়টা তদন্তের স্বার্থেই জানতে চাচ্ছি... ।'

'বেশ তো, বলুন না, কি জানতে চান?'

'যা জানতে চাই সেটা হয়তো ইতিমধ্যেই জেনে গেছি, তবুও আপনার মুখ থেকেই তা শুনতে চাই,' কৌতুক খেলা করছে আসাদের চোখের তারায়।

অন্যদিকে বিস্ময়ে চোখ বড় বড় হয়ে গেছে লিজার। 'ওহ্, তা হলে জেনেই ফেলেছেন ব্যাপারটা! না, আমি আর কোনকিছুই গোপন করব না। কিছুদিন আগে রবার্টের সঙ্গে বাগদান হয়েছিল আমার।'

মুখ থেকে কথা সরল না আমার। রবার্টের সঙ্গে লিজার বাগদান হয়েছিল! অথচ কেউই তা জানে না!

'রবার্টের মৃত্যু সম্পর্কে চূড়ান্ত সরকারী ঘোষণার কথা আপনি কখন শুনলেন?' জিজ্ঞেস করল আসাদ।

'কাল সকালে এ ব্যাপারে কে যেন বলাবলি করছিল। তবু বিশ্বাস হতে চায়নি। রাত আটটার খবরে নিজ কানে শোনার পর নিশ্চিত হলাম। কিন্তু মনকে শক্ত রেখেছিলাম যাতে অতিথিদের সামনে কোন কিছু প্রকাশ না পায়।'

'আচ্ছা, কতদিন আগে আপনাদের বাগদান হয়েছিল?'

'গত সেপ্টেম্বরে। আমরা চিটাগাং বেড়াতে গিয়েছিলাম। ঘটনাটা সেসময়ই ঘটে। বাগদান হলো ঠিকই কিন্তু পুরো ব্যাপারটা গোপন রাখতে বলেছিল ও।'

'কেন?'

'ওর দাদা মেয়ে মানুষের নাম পর্যন্ত সহ্য করতে পারত না। তাই আমাদের ব্যাপারটা যাতে তাঁর কিংবা অন্য কারোর কানে না যায় সে ব্যাপারে বরাবরই সতর্ক ছিল ও।'

'কিন্তু তবু, এসব কথা কেউ না কেউ জেনেই যায়! আচ্ছা এ ব্যাপারে কখনও কি রিয়াকে কোনরকম আভাস দিয়েছিলেন?'

কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকার পর লিজা বলল, 'না, কথাটা কাউকে বলেছি বলে তো মনে পড়ছে না।'

'কিন্তু রবার্টের দাদা যখন মারা গেলেন তখনও কি কারো কাছে কথাটা খুলে বলার ইচ্ছে হয়নি?'

'না। একে তো রবার্টের দেশ জোড়া সুনাম। উপরন্তু কোটিপতির

একমাত্র নাতি। সেক্ষেত্রে ওর সাথে আমার বাগদানের ব্যাপারটা অনেকেই হয়তো খুব সহজভাবে নিত না।'

ঘড়ি দেখল আসাদ। বেলা গড়িয়ে যাচ্ছে। 'তো, ওঠার আগে কয়েকটা ব্যাপারে আপনাকে সতর্ক করে দিতে চাই। কোন বন্ধু-বান্ধবীর সঙ্গে দেখা করা চলবে না। বাইরে থেকে পাঠানো খাবার জিনিস ভুলেও মুখে দেবেন না। আর বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া কেবিনের বাইরে বেরোবেন না।'

আসাদের সাবধানবাণী শুনে চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেল লিজার। 'আপনি কি এখনও আমার উপর হামলার আশঙ্কা করছেন?'

'না, ঠিক তা নয়। এখানে আপনি প্রায় সম্পূর্ণ নিরাপদ। তবু সাবধানের মার নেই।'

লিজার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে উঠে পড়লাম আমরা। ওর কেবিন থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির কাছাকাছি চলে এসেছি প্রায়, হঠাৎ কি মনে করে কেবিনের দিকে ফিরে চলল আসাদ। পেছন পেছন আমিও। 'একটা জরুরী কথা মনে পড়ায় আবার বিরক্ত করতে এলাম। আপনি বলেছিলেন অপারেশনের সময় একটা উইল নাকি করা হয়েছিল, সেটা কোথায়?'

কয়েক মুহূর্ত কি যেন ভাবল লিজা। 'খুব সম্ভবত বাড়িতেই আছে সেটা। মনে হয়, বিভিন্ন বিলের রসিদ যে ফাইলে রেখেছি সেখানেই আছে উইলটা। কিংবা বেডরুমেও থাকতে পারে।'

'আপনার বাড়িতে গিয়ে উইলটা বের করলে আপত্তি নেই তো?'

'না, না, আপত্তি কিসের! বরং ওটা খুঁজে পেলে আমারই উপকার হবে। কোথায় যে রেখেছি, কিছুতেই ঠিক মনে করতে পারছি না।'

'আততায়ীর বুদ্ধি আছে বলতে হবে,' নার্সিং হোম থেকে ফেরার পথে মন্তব্য করল আসাদ।

'তা ঠিক,' সায় দিয়ে বললাম, 'এ নিয়ে লিজার উপর কয়েকবার আক্রমণ হলো একটা খুনও হয়ে গেল। কিন্তু এখন পর্যন্ত তার টিকিটিও স্পর্শ করতে পারলাম না।'

'আমি সেসব নিয়ে ভাবছি না। ভাবছি অন্য কথা। যা উদ্‌ঘাটিত হলে সমস্ত ঘটনার চেহারাই পাল্টে যেতে পারে।'

'অত ভণিতা না করে খুলেই বল না!'

'মাত্র কিছুদিন আগে রবার্টের দাদা মারা যান। তিনি দেশের হাতেগোনা ধনীদের একজন ছিলেন। একমাত্র উত্তরাধিকারী হিসেবে দাদার সম্পত্তি রবার্টের পাওয়ার কথা। পরের ঘটনা হলো, গ্লাইডারসুদ্ধ ও বঙ্গোপসাগরে নিখোঁজ। এবং এর পর পরই লিজার উপর আক্রমণ আসতে

শুরু হলো। ধরে নিই, গ্লাইডার-যাত্রার আগে একটা উইল করেছিল রবার্ট। যেহেতু ওর কোন নিকট-আত্মীয় নেই; তাই উইলে পুরো সম্পত্তিই লিজাকে লিখে দিয়েছিল–আর এটাই স্বাভাবিক।'

'এটা তো তোমার অনুমান মাত্র; কোন প্রমাণ হাজির করতে পারবে?'

'অনুমান হলেও সবকিছু কিন্তু খাপে খাপে মিলে যাচ্ছে। আর তাই যদি না হবে তাহলে এ ক'দিনের ঘটনাগুলো কোন অর্থ দাঁড় করানো যাবে না।'

'কিন্তু লিজার সাথে ওর বাগদানের কথাটা তো কেউ জানে না।'

'ধ্যাত্! কেউ জানে না এমন কিছুর অস্তিত্ব নেই। সব কথাই আগে হোক আর পরেই হোক, কেউ না ঠিক ঠিকই জেনে যায়। লিজা না বললেও রবার্ট হয়তো কাউকে বলে থাকতে পারে। কিংবা এমনও হতে পারে, ওদের পরস্পরের কাছে লেখা কোন চিঠি থেকে ব্যাপারটা কেউ জেনে গেছে। আর এদিক দিয়ে বিচার করলে কথাটা রিয়ার জানার সুযোগ অন্য যে কারোর চেয়ে বেশি।'

'আচ্ছা, লিজার উইলের বিষয়বস্তু কি রিয়া জানত?'

'না জানার কোন কারণ তো দেখছি না। তো যে কথা বলছিলাম, কাল লিজা মারা গেলে ওর সম্পত্তির মালিকানা চলে যেত উইলে মনোনীত ব্যক্তি কিংবা ব্যক্তিবর্গের হাতে। আর তাতে রিয়াই লাভবান হত সবচেয়ে বেশি। এ ছাড়া এখানে আরও একজনের কথা চলে আসে–অ্যালবার্ট।'

'কিন্তু ওকে দিয়েছে কেবল বাড়িটা, আর সব কিছুই তো রিয়ার নামে লিখে দিয়েছিল লিজা।'

'এ কথা অ্যালবার্টের জানা না-ও থাকতে পারে। আর তাই কাল রাতে লিজার মৃত্যু হলে ধারণামত, নিকট–আত্মীয় হিসেবে লিজার সমস্ত সম্পত্তির সিংহভাগ ওরই পাবার কথা।'

'তাহলে দেখা যাচ্ছে ঘুরে ফিরে দুটো নামই বারবার উঠে আসছে সন্দেহ তালিকার সবচেয়ে উপরে।'

আঁকাবাঁকা পথ ধরে কিছুক্ষণের মধ্যে লিজার বাড়ি পেঁছে গেলাম। ওপর থেকে আমাদের দেখতে পেয়ে এসে দরজা খুলে দিল বুয়া। তার চোখেমুখে আতঙ্কের ছাপ। আসাদের এক প্রশ্নের উত্তরে মুখে যেন খই ফুটল তার, 'কি কৈতাম সাব, বাড়িটা বেশি ভালা না। দেয়ালে কান পাতলে আফনেও টের পাইবেন। আমার বয়স যখন ছয় বছর তখন থিকা এই বাড়িতে আছি। আফামণির দাদা আমারে নিজের মাইয়ার মতই দ্যাখতেন। বাড়িটা আসলেই খুব খারাপ। খারাপ লোকের আত্মা আর ভূত-পেত্নী আইসা রাতে আসর জমায়। আফামণিরে কত কইছি এই বাড়িটা ছাইড়া

দিয়া নতুন বাসা ভাড়া লইতে-হে কুনো কথা কানে লয় না.... ।'

ওর কথায় বাধা দিযে হঠাৎ বলে উঠল আসাদ, 'কাল রাতের বেলা কোন গুলির শব্দ শুনতে পেয়েছিলে, এই ধর আটটার দিকে?'

'না তো, বাজির আওয়াজেই কান ফাইট্যা যাওনের জোগাড়, গুলির শব্দ হুননের সময় কই?'

'আচ্ছা, ভাল করে ভেবে বল তো, ঐ সময় কি করছিলে?'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর মুখ দিয়ে কথা বেরুলো বুয়ার, 'তহন বাসন–পেয়ালা ধোওনের কামে ব্যস্ত আছিলাম ।'

'মানে, বাজি পোড়ানো দেখতে বাইরে যাওনি?'

'না, হাতে বহু কাম জইমা আছিল তাই সময় পাই নাই ।'

'ঐ সময় কি লিজার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল?'

'হ, ফোন ধরনের লেইগা একবার এই দিকে আইছিল । তারপরে আর দেহি নাই । হেই সময় এলি আফামণির লগেও দেহা হইছিল একবার–গরম চাদর লওনের লেইগা উপরে যাইতে ছিলেন তহন ।'

'যাক, এবারে বল তো, এই বাড়িতে কি কোথাও তলকুঠুরি আছে?'

চোখ বড় বড় করে আসাদের দিকে চাইল বুয়া । বোধহয় কথাটার মানে বুঝতে পারেনি । আসাদ সহজ করে বুঝিয়ে দিতেই সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল ও । 'হ, আমি যখন খুব ছোট তখন যেমুন একদিন এই রকম ছোট একটা খুপরি কোথায় যেমুন দেখছিলাম । কিন্তু কোন্ ঘরে এই খুপটিটা আছে অহন তা মনে নাই ।'

'তুমি কি একেবারে নিশ্চিত, বাড়ির কোথাও এরকম একটা খুপরি আছে?'

'জ্বে ।'

বুয়া চলে যাবার পর আসাদকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা, বাড়িতে কোন তলকুঠুরি কিংবা খুপরি আছে কিনা তা জানার জন্য এত আগ্রহ দেখাচ্ছ কেন?'

'মনে আছে আমাদের সেই তালিকাটার কথা? ঐ তালিকার দশ নম্বরী ভদ্রলোক কিংবা ভদ্রমহিলা যদি কাল রাতে তলকুঠুরিতে নিজেকে লুকিয়ে রেখে পরে সময়মত বের হয়ে আঘাত হেনে শটকে পড়ে তাহলে খুব একটা অবাক হবার কিছু থাকবে না । যাক, এবারে চল, লিজার রুমে গিয়ে উইলটার খোঁজ করি ।'

লিজার বেডরুম দোতলায় । কিছুটা অগোছাল । কাপড়-চোপড় ও অন্যান্য জিনিসপত্র রুমের চারদিকে ছড়ানো ছিটানো । ওর অনুপস্থিতিতে

কেউ রুমে ঢুকে জিনিসপত্র হাতড়েছিল কিনা কে জানে! কথাটা আসাদকে বললাম। সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল ও। একটা চেষ্ট অভ ড্রয়ারের ভেতরে বেশ কিছু কাপড়-চোপড় পাওয়া গেল। বেশির ভাগই মেয়েদের অন্তর্বাস। একটা কাগজের বাণ্ডিলও চোখে পড়ল। সেটায় নানারকম বিলের রসিদ। একটা চিঠিও পাওয়া গেল। তারিখ নেই। রিয়া লিখেছে ঃ

লিজা,

শুভেচ্ছা নিস। সেদিন আসরটা জমেছিল ভালই। না এসে ভাল করেছিস। এ এক সর্বনাশ নেশারে! জিনিস ফুরিয়ে গেলেই মাথা খারাপ হবার অবস্থা হয়। একজনকে বলেছি তাড়াতাড়ি কিছু যোগাড় করে পাঠিয়ে দেয়ার জন্য। জীবনটাই এখন কেমন যেন দুঃসহ হয়ে উঠেছে।

ভাল থাকিস–

রিয়া।

বোঝা গেল, নেশা করে রিয়া। কিন্তু ওকে দেখে তো মনে হয় না। হয়তো চূড়ান্ত সর্বনাশ এখনও হয়নি। চেষ্ট অভ ড্রয়ারে আর তেমন কিছু পাওয়া গেল না। পাশের টেবিলে রাখা লিজার ড্রাইভিং লাইসেন্স, ব্লু বুক ইত্যাদি উল্টেপাল্টে দেখতে লাগল আসাদ। টেবিলের ড্রয়ারটা টান দিলাম। কয়েকটা খাতা আর রাইটিং প্যাড পাওয়া গেল। ওগুলো নেড়েচেড়ে দেখতে গিয়ে ভেতর থেকে বেরিয়ে এল ছোট একটা চিঠির বাণ্ডিল। চিঠিগুলো রবার্টের লেখা। চিঠিগুলো তুলে দিচ্ছিঃ

ডার্লিং জানুয়ারি,

১

ভালবাসা। আর সাথে রইল নববর্ষের শুভেচ্ছা। তোমার কথামত রুটিনমাফিক চলাফেরায় মন দিয়েছি। সত্যি, আমার এই ছন্নছাড়া জীবনে শুধু তোমার ভালবাসাই বাঁচিয়ে রেখেছে আমাকে। মাঝেমধ্যে নিজেই অবাক হয়ে যাই, সত্যি কি তুমি আমাকে এত ভালবাস? চট্টগ্রামের ঐ দিনগুলোর কথা চিরদিন মনে থাকবে আমার।

তোমারই–

রবার্ট।

এই,

ফেব্রুয়ারী, ৮

লক্ষ্মী মেয়ে, রাগ কর না। জানোই তো, তোমাকে দেখার জন্য আমি

কতটা উতলা হয়ে থাকি। আসলে বুড়ো দাদাটাই যত গণ্ডগোলের মূল। তোমার সঙ্গে আমাকে দেখতে পেলে নির্ঘাত বন্দুক নিয়ে তাড়া করবে বুড়ো। আশা, করি, পুরো ব্যাপারটা তুমি বুঝবে।

ভাল থেকো।
তোমারই–
রবার্ট।

লক্ষ্মী মেয়ে,

ভালবাসা নিও। তোমার অনুপ্রেরণাতেই তো সব কিছু এত সুন্দর ভাবে গুছিয়ে এনেছি। যদি গ্লাইডারে করে বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়ে ঠিক ঠিকই চক্কর দিয়ে আসতে পারি তা হলে আর পায় কে! তখন তোমাকে সঙ্গে নিয়ে বুক ফুলিয়ে বুড়োর সামনে দাঁড়ানো যাবে। এ নিয়ে দুশ্চিন্তা করনা।

তোমারই–
রবার্ট।

ডার্লিং

ভালবাসা জেনো। তোমার বুদ্ধির কোন তুলনা হয় না। তোমার কথাই আসলে সত্যি। ঐ চিঠিটা আমি সব সময় যত্ন করে নিজের কাছে রাখি। কি বলব, অন্যসব মেয়েদের চেয়ে তুমি এতই আলাদা রকমের যে মাঝেমধ্যে ভাবনা এসে মনে ভিড় করে–তুমি কি সত্যিই মানুষ, নাকি দেবী?

ভাল থেকো–
রবার্ট।

শেষ চিঠিটাতে কোন তারিখ ছিল না।

লক্ষ্মীটি, কাল রওনা হচ্ছি। রোমাঞ্চ আর উত্তেজনায় ছেয়ে আছে মন। তুমি আবার এ ব্যাপারটা নিয়ে দুশ্চিন্তা কোরো না। এরকম কাজে ঝুঁকি তো কিছু থাকবেই। কিন্তু তোমার ভালবাসার জোরে সেই ঝুঁকিটুকু অনায়াসেই অতিক্রম করে যাবে।

ঝুঁকির কথা মাথায় রেখেই এক বন্ধু বলেছিল একটা উইল করতে। কিন্তু এখন আমি এত ব্যস্ত যে চট্টগ্রামে গিয়ে সলিসিটরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারিনি। তাই সাক্ষী রেখে সাদা কাগজেই উইলটা লিখে ওর ঠিকানায় পাঠিয়ে দিয়েছি। তোমার পুরো নাম তো এলিজাবেথ গোমেজ, তাই না? কিন্তু বাবার নামটা মনে নেই। অবশ্য দাদার নাম মাইকেল গোমেজ ঠিক ঠিকই মনে আছে। যাক, এ শুধু বন্ধুর অনুরোধ রক্ষার জন্যই

করা। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার, কয়েকদিনের মধ্যেই দেখা হচ্ছে আমাদের।

তোমারই–
রবার্ট।

চিঠিগুলো পড়া শেষ করে জায়গামত রেখে দিল আসাদ। হঠাৎ করেই ওর চোখমুখ যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। 'দেখলে, যা আন্দাজ করেছিলাম, ঘটনাটা কিন্তু সেই পথেই এগুচ্ছে। রবার্টের উইলের ব্যাপারটা এখন আর অনুমান মাত্র নয়। যে-কোন অর্ধশিক্ষিত লোকও চিঠিটা পড়লে পরিষ্কার বুঝতে পারবে সবকিছু।'

'বুয়ার পক্ষে কি চিঠিটার মর্ম উদ্ধার করা সম্ভব?'

'খুবই সম্ভব! প্রাতিষ্ঠানিক কোন শিক্ষাদীক্ষা না থাকলেও অক্ষরজ্ঞান নিশ্চয়ই আছে ওর।'

'আমরা কিন্তু আসল জিনিসটা এখনও খুঁজে পেলাম না–লিজার উইল।'

'হুঁ। লিজাকে এ ব্যাপারে আবার একটু জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে। হয়তো অন্য কোথাও রেখেছে, মনে করতে পারছে না। ওর মত অগোছাল মেয়েদের স্বভাবই এই।'

আমরা নিচে নামতেই বুয়ার সঙ্গে আবারও দেখা হলো। কোনরকম রাখঢাক না করে সরাসরি ওকে জিজ্ঞেস করল আসাদ, 'তোমার আপামণির সঙ্গে নাকি রবার্টের বিয়ের কথাবার্তা পাকা হয়েছিল?'

চোখ কপালে উঠল বুয়ার, 'কন কি! এমুন কথা তো কুনদিন কাউরে কইতে হুনি নাই?'

লিজার বাড়ি থেকে বের হয়ে একটা রিকশায় চাপলাম। নার্সিং হোমে গিয়ে উইলেল ব্যাপারে ওকে আবার জিজ্ঞেস করতে হবে।

আবার আমাদের দেখতে পেয়ে একটু যেন অবাকই হলো লিজা। চোখেমুখে একরাশ জিজ্ঞাসা। আসাদ ওর মনের ভাব বুঝতে পেরে বলল, 'আপনার রুমটায় আমরা দুজনে মিলে তন্নতন্ন করে খুঁজেছি কিন্তু উইলটার হদিস করা যায়নি!'

'বাদ দিন। ওটা না পেলেও কোন ক্ষতি নেই। আমি তো এখনো দিব্যি বেঁচেবর্তে আছি।'

'তা ঠিক। কিন্তু তদন্তের জন্য উইলটা খুঁজে পাওয়া অত্যন্ত জরুরি। আপনি আর একটু মনে করার চেষ্টা করুন তো, ওটা অন্য কোথাও

রেখেছেন কিনা!'

কয়েক মুহূর্ত কি যেন ভাবল লিজা। 'আমার তো কিছুতেই মাথায় আসছে না; গেল কোথায়, উইলটা!'

'বাড়ির গুপ্ত কুঠুরিতে রাখেননি তো আবার?'

'মানে?' ভ্রু কুঁচকে গেল লিজার।

'বুয়া বলছিল বাড়ির কোথায় যেন একটা গুপ্ত কুঠুরি আছে।'

'রাবিশ! বাড়িতে এ ধরনের কিছু একটা থাকলে আমি জানব না?'

'আমারও তো সেই একই প্রশ্ন। কিন্তু বুয়া এ ব্যাপারে প্রায় নিশ্চিত। ওর ছোটবেলায় আপনার দাদা নাকি ওকে কুঠুরিটা দেখিয়েও ছিলেন একদিন। কুঠুরিটা ঠিক কোথায়, এত বছর পরে সেটা আর মনে নেই ওর।'

'কি জানি! তবে যা-ই বলুন না কেন, গুপ্তকুঠুরির কথাটা আজই প্রথম শুনলাম।'

'যাক এবারে অন্য কথায় আসি। কাল রাতে বাজি পোড়ানো দেখার জন্য আপনি কি বুয়াকে ছুটি দিয়েছিলেন?'

'এ ব্যাপারে ছুটি দেয়ার কিছু নেই। বাড়ির কাজের লোকেরা ঐ সময় ইচ্ছে হলে উঠোনে বসে বাজি পোড়ানো দেখতে পারে। অনেকদিন আগে থেকেই এ নিয়ম চলে আসছে।'

'কিন্তু বুয়া কাল রাতে বাজি পোড়ানো দেখার জন্য ঘর ছেড়ে বাইরে বেরোয়নি।'

'বাজি পোড়ানো দেখার ব্যাপারে বুয়া বরাবরই আগ্রহী। তা সে যত কাজই হাতে থাকুক না কেন। আর তাই তো ব্যাপারটা আমার কাছে কেমন যেন বেখাপ্পা মনে হচ্ছে।'

'বুয়া কিন্তু বাজি পোড়ানো না দেখার সত্যিকার কারণটা আমাদের বলেনি,' অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে, লিজার দিকে চাইল আসাদ।

'তা ছাড়া বাড়িতে গুপ্তকুঠুরি আছে–এরকম একটা কথা কেন ছড়াচ্ছে, সে?'

'যাক, যে জন্য আপনার বাড়িতে যাওয়া সেই কাজটাই কি হলো না। আচ্ছা, উইলটা লেখার সময় আপনি কি উইল ফর্ম ব্যবহার করেছিলেন?'

'না, খুব তাড়াহুড়োর মধ্যে ওটা করা হয়েছিল। সাদা কাগজই ব্যবহার করেছিলাম। এ ছাড়া মি. ডি কস্টা বললেন ছাপানো ফরমে কখনো কখনো নাকি দারুণ সমস্যার সৃষ্টি হয়; তার চেয়ে উপযুক্ত সাক্ষী রেখে সাদা কাগজে করলেই সুবিধে...ওহ্,' কি আশ্চর্য! এ রকম একটা কথা ভুলে গেলাম কি করে! আরে, উইলটা সেই সময়েই তো মি. ডি কস্টাকে

দিয়েছিলাম চট্টগ্রামে অ্যালবার্টের ঠিকানায় পোস্ট করার জন্য। আর এদিকে খামকাই হয়রানি করলাম আপনাদের। মনে হচ্ছে, স্মরণশক্তি লোপ পেয়েছে আমার!'

'উইলে সাক্ষী কারা ছিল?'

'বুয়া ও তার স্বামী। আপনারা ইচ্ছে করলে চট্টগ্রামে অ্যালবার্টের অফিসে গিয়ে উইলটা দেখে আসতে পারেন।'

'কিন্তু সেক্ষেত্রে আপনার অনুমতিরপত্র ছাড়া উইলটা দেখাতে উনি কি রাজি হবেন?'

ব্যাপারটা যেন মাথায় ঢুকল না লিজার। সাইড টেবিল থেকে কাগজ-কলম নিয়ে আসাদ যা যা বলল তাই-ই লিখে নিল ও। শেষে একটা সই দিয়ে কাগজটা বাড়িয়ে দিল আমাদের দিকে। এবারে উঠতে হবে। হঠাৎ নজর গেল পাশের টেবিলে রাখা একগুচ্ছ টাটকা রজনীগন্ধার দিকে। 'রিয়া পাঠিয়েছে,' বলল লিজা, 'আর ফিরোজ পাঠিয়েছে লাল গোলাপের তোড়া। আর এই দেখুন,' একটা চৌকো বাক্স বের করল ও, 'আপেলগুলো পাঠিয়েছেন মি. ডি কস্টা।'

মুহূর্তেই চেহারা পাল্টে গেল আসাদের, 'ওগুলো থেকে কি আপনি খেয়েছেন?'

'না, এখনো খাইনি, কেন বলুন তো?'

'আপনাকে আবারও সাবধান করে দিচ্ছি, বাইরে থেকে পাঠানো কোনকিছু মুখে দেয়া চলবে না।'

চোখেমুখে বিস্ময় ফুটে উঠল লিজার, 'আপনি কি মনে করেন চক্রান্ত এখনো শেষ হয়নি! আততায়ী কি শেষ পর্যন্ত নার্সিং হোমেও হামলা চালাবে?'

'না, আপনি এখানে সম্পূর্ণ নিরাপদ,' অভয় দিল আসাদ, 'কিন্তু তবু, সাবধানের মার নেই।'

বিদায় নেয়ার সময় লিজার ফ্যাকাশে চেহারায় স্পষ্ট আতঙ্কের ছাপ দেখতে পেলাম।

সাত

চট্টগ্রাম পৌঁছোতে লেগে গেল ঝাড়া তিন ঘণ্টা। জাফরের জীপটা পাওয়া গিয়েছিল বলেই রক্ষা, বাসে কিংবা কোস্টারে গেলে এবড়ো-থেবড়ো রাস্তার ঝাঁকুনির চোটে নাড়ীভুঁড়ি হজম হয়ে যেত।

অফিসেই পাওয়া গেল অ্যালবার্টকে। আমাদের দেখে খুব একটা খুশি হয়েছে বলে মনে হলো না। তবু ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটিয়ে বলল, 'বলুন, আপনাদের জন্য কি করতে পারি?'

পকেট থেকে লিজার লেখা অনুমতিপত্রটা বের করে অ্যালবার্টের হাতে দিল আসাদ। সেটায় কয়েকবার চোখ বুলিয়ে বলল ও, 'কিন্তু আমি তো এর মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'কেন, অনুমতিপত্রে লিজা কি সবকিছু পরিষ্কার করে লেখেনি?'

'না, না, বিষয়বস্তু ও খোলাসা করেই লিখেছে। আর সেখানেই হয়েছে সমস্যা। চিঠিতে আপনাদের কাছে লিজার উইলের কপি দিতে বলা হয়েছে, যা নাকি গত ফেব্রুয়ারী থেকেই আমার কাছে আছে।'

'তা হলে, আপত্তিটা কোথায় আপনার?'

'মি. রহমান,' গলার স্বর খানিকটা চড়ল অ্যালবার্টের, 'এর কম কোন উইল আমার কাছে গচ্ছিত রাখতে দেয়া হয়নি।'

'আশ্চর্য!'

'হ্যাঁ, আশ্চর্যই বটে! আমি যতদূর জানি লিজা কখনোই কোন উইল করেনি।'

'কিন্তু ওর অপারেশনের ঠিক আগে সাদা কাগজে একটা উইল করেছিল বুয়া আর তার স্বামীকে সাক্ষী রেখে। সেটা ডাকযোগে আপনার কাছে পাঠানো হয়েছিল।'

'যদি তাই হয়ে থাকে তা হলে সেটা আমার ঠিকানায় পৌঁছেনি।'

'সেক্ষেত্রে আপনার কাছ থেকে আমাদের আর বিশেষ কিছু জানার নেই

বোধহয়।' উঠে দাঁড়াল আসাদ।

'মনে হয় পুরো ব্যাপারটায় কোথাও কোন ভুল হয়েছে,' আমাদের বিদায় জানানোর সময় মন্তব্য করল অ্যালবার্ট।

সেই এবড়োথেবড়ো পথে আমাদের জীপ ফিরে চলল কক্সবাজারের উদ্দেশে। উইলের ব্যাপারটা যে আসাদকে বেশ ভাবিয়ে তুলেছে তা ওর চেহারা দেখেই বেশ বোঝা যাচেছ। বললাম, 'তোমার কি মনে হয় অ্যালবার্ট এ ব্যাপারে মিথ্যে কথা বলেছে?'

'বলা মুশকিল। আর এ ধরনের মানুষ একবার কোনকিছু বলে ফেললে তা থেকে কিছুতেই তাকে টলানো যায় না। উইলের ব্যাপারটা একবার যখন অস্বীকার করেছে, তখন কিছুতেই তাকে দিয়ে আর অন্যরকম কিছু বলানো যাবে না।'

'লিজাকে আরেকবার জিজ্ঞেস করলে হয়, উইলের প্রাপ্তি স্বীকারপত্র নিশ্চয়ই থাকবে ওর কাছে।'

'কি যে বলো, তার ঠিক নেই। যে উইলেরই কোন খোঁজ রাখে না, সে রাখবে প্রাপ্তিস্বীকার পত্র!'

জীপ আমাদের হোটেলের কাছাকাছি এসে পড়েছে। আসাদ ড্রাইভারকে লিজার বাড়ির দিকে যেতে বলল। 'ডি কস্টাদের সঙ্গে উইলের ব্যাপারে আলাপ করতে হবে,' বলল আসাদ, 'কারণ উইলটা করার জন্য যাবতীয় প্রস্তুতি মি. ডি কস্টাই সম্পন্ন করেছিলেন।'

রাতের খাবারের আয়োজন করছিলেন মি. ডি কস্টা। আমাদের আসার খবর পেয়ে বেরিয়ে এলেন। নোংরা হাত। তাই করমর্দন না করে ভেতরে চলে গেলেন। হঠাৎ শিসের শব্দ শোনা গেল। একটু পর মি. ডি কস্টা আবার বেরিয়ে এসে ভেতরে নিয়ে গেল আমাদের। মিসেস ডি কস্টাকে দেখলাম আগের মতই হাস্যো-জ্জ্বল। আমাদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়ে লিজার খবর এবং এলির খুনের অনুসন্ধানের ব্যাপারে একের পর এক প্রশ্ন করে যেতে লাগলেন। যতটা সম্ভব সংক্ষেপে সেগুলোর উত্তর দিয়ে চলল আসাদ। এক সময় উনি একটু ক্ষান্ত হতেই চট্ করে কাজের কথায় চলে এলে ও, 'ভাল কথা, লিজার অপারেশনের আগে যে উইলটা করা হয়েছিল তাতে সাক্ষী কারা ছিল?'

'বুয়া আর তার স্বামী।'

'উইলটা লেখার পর অ্যালবার্টের ঠিকানায় পোস্ট করার জন্য আপনাদের কাছেই তো দেয়া হয়েছিল...।'

'হ্যাঁ, আমি নিজে সেটা খামে ভরে অ্যালবার্টের ঠিকানায় পোস্ট

করেছিলাম,' এবারে জবাব দিলেন মি.ডি কস্টা।

'আজ বিকেলে চট্টগ্রামে গিয়ে অ্যালবার্টের সঙ্গে দেখা করেছি। উইলের কথা তুলতেই ও বলল এরকম কোন উইল ওর হাতে পৌঁছোয়নি।'

'আশ্চর্য! আমি তো ওর ঠিকানা লিখে, ডাকটিকেট লাগিয়ে রাস্তার ধারের ঐ ডাকবাক্সটায় নিজে গিয়ে পোস্ট করেছি!'

'আপনি নিশ্চিত, রাস্তার ধারের ঐ ডাকবাক্সতেই সেটা ফেলেছিলেন? কোন রকম ভুল ভ্রান্তি... ।'

'ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি, আমি ঐ ডাকবাক্সতেই উইলটা পোস্ট করেছিলাম,' অসুন্তুষ্ট গলায় উত্তর দিলেন ডি কস্টা।

'যাক এ নিয়ে খামকা সময় নষ্ট করে লাভ নেই। লিজা তো বহাল তবিয়তে এখনো বেঁচেবর্তে আছে। আর তাই ঐ উইলের তেমন কোন মূল্য নেই।'

ডি কস্টাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হোটেলের পথে হাঁটতে শুরু করলাম আমরা। কথা হচ্ছিল উইলটার ব্যাপারেই। বললাম, 'এখানে মিথ্যে বলছে কে, অ্যালবার্ট নাকি ডি কস্টা?'

'ডি কস্টার মিথ্যে বলার পেছনে কোন কারণ দেখছি না। উইলটা লুকিয়ে রেখে তার কোন লাভ নেই। এ ছাড়া লিজার বক্তব্যের সঙ্গে ওর কথা পুরোপুরি মিলে যায়। উইলের ব্যাপারে ডি কস্টারা হয়তো সত্যি কথাই বলেছে, কিন্তু ওদের চালচলনে কেমন যেন একটা লুকোচুরির ব্যাপার আছে। আজ আমরা যখন ওদের ওখানে পৌঁছলাম তখনও সেদিনের মত শিসের শব্দ ভেসে আসছিল।'

'হ্যাঁ, আমিও শুনেছি।'

'আজ ডি কস্টা রান্না করার সময় তার তেল মাখানো হাত একটা কাগজে মুছেছিল। সবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে আমি ঐ কাগজটা নিয়ে এসেছি। কাগজটা জাফরকে দিয়ে পরীক্ষা করানোর ব্যবস্থা করতে হবে।'

রাতের খাওয়া সারতে সারতে প্রায় দশটা বেজে গেল। আসাদ বেশ যুত করে একটা সিগারেট ধরিয়েছে। আমি শুয়ে পড়ব কিনা ভাবছি, এমন সময় দরজায় টোকা পড়ল, খুলে দিতেই ভেতরে ঢুকলেন কক্সবাজার থানার এসআই মি. ওয়াকার হাসান। এর আগেও দিন দুয়েক দেখা হয়েছে ভদ্রলোকের সঙ্গে। এই ক'দিনে আসাদের সঙ্গে বেশ অন্তরঙ্গতা জন্মেছে ওঁর। এলির হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে কথা উঠতেই উনি বললেন, 'লিজাকে এভাবে অনির্দিষ্ট কালের জন্যে তো নার্সিং হোমে পাহারা দিয়ে রাখা যাবে না।'

'তা ঠিক,' সায় দিল আসাদ, 'কিন্তু আপাতত এ ছাড়া আমাদের তেমন কিছুই করার নেই।'

'আততায়ী যে পিস্তলটা ব্যবহার করেছে সেটারও কোন হদিস পাওয়া গেল না–পেলে সূত্র হিসেবে খুবই কাজে লাগত আমাদের।'

'ওটা আর খুঁজে পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। সমুদ্রের তলায় বরং খুঁজে পেতে পারেন!'

'আচ্ছা, খুনী হিসেবে আপনার কাকে বেশি সন্দেহ হয়?'

'তাৎক্ষণিক মোটিভ বিচার করলে অ্যালবার্ট আর রিয়াকেই সন্দেহ তালিকার প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানে রাখতে হয়।'

'আমারও তাই মনে হয়। তবে খুনী যদি অ্যালবার্ট হয় তা হলে খুব হিসেব করে এগুতে হবে আমাদের। লোকটা একেই তো উকিল তার উপর যথেষ্ট সাবধানী। আর রিয়া হলে জাল পাতা সহজ হবে। মেয়েমানুষের স্বভাব তো, সহজেই অধৈর্য হয়ে পড়ে। হয়তো দুই একদিনের মধ্যে আবার হামলার পরিকল্পনা করতে পারে।'

'মি. হাসানের কথায় মাথা নেড়ে সায় দিল আসাদ। বিদায় নেয়ার জন্য উঠে দাঁড়িয়েও আবার বসে পড়লেন তিনি। পকেট থেকে একটা দোমড়ান কাগজ বের করে আসাদের দিকে বাড়িয়ে দিলেন তিনি। হাতের চেটো দিয়ে সেটা সমান করে চোখ বুলাল আসাদ। আমিও দেখলাম কাগজটা। তাতে লেখাঃ '...টাকা দিতেই হবে...যদি না দাও...বুঝবে মজা...এই শেষবারের মত...।' কাগজটা মাঝ বরাবর দু-ভাগ হয়েছে, দেখলেই বোঝা যায়।

মৃতদেহের সামান্য দূরে কাগজটা পাওয়া গেছে,' বললেন মি. হাসান।

'এটা কি আমার কাছে রাখতে পারি?'

'অবশ্যই। যদিও এতে কোন আঙুলের ছাপ নেই। তবু দেখুন, তদন্তের কাজে হয়তো এটা কোনভাবে সাহায্য করতে পারে,' উঠে দাঁড়ালেন মি. হাসান।

কাগজটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে ভাল করে পরীক্ষা করল আসাদ। আমিও আর একবার ভাল করে পরখ করলাম কাগজটা। হাতের লেখাটা এর আগে কোথাও যেন দেখেছি...। হ্যাঁ, এবারে মনে পড়েছে। রিয়ার বাড়িতে বাজে কাগজের স্তূপে এই হাতের লেখাটা যেন দেখতে পেয়েছিলাম। কিন্তু এটা রিয়ার হাতের লেখা নয়। কথাটা বললাম আসাদকে। সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল ও। কাগজটা পাশের টেবিলে পেপারওয়েট চাপা দিয়ে রাখল। সারাদিনের ধকলের পর দু'চোখ যেন

আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে আসছে। আর দেরি না করে শুয়ে পড়লাম।

পরদিন সকালে নাশতা সেরে বাইরে বেরোনোর জন্য তৈরি হচ্ছি, এমন সময় দরজায় টোকা পড়ল ক্যাপ্টেন হোবার্ট। এই সাত সকালেই ক্যাপ্টেনের শ্রীমুখ দেখার জন্য আমরা কেউ তৈরি ছিলাম না। বোধহয় সে কথা বুঝতে পেরে কোনকিছু জিজ্ঞেস করার আগেই সাফাই গাইতে শুরু করল সে, 'যাচ্ছিলাম এদিক দিয়ে। মর্নিং ওয়াকে বেরিয়েছিলাম, ভাবলাম লিজার ব্যাপারে নতুন কোন খবর থাকলে জেনেই যাই বরং...'

'না, এমুহূর্তে নতুন কোন খবর আপনাকে দিকে পারছি না। বলে দুঃখিত,' বলল আসাদ।

'তদন্তের কি কোনই অগ্রগতি হয়নি?'

'অগ্রগতি তো হয়ইনি, এখন মনে হচ্ছে, যেন পিছিয়ে পড়েছি আমরা। শেষ পর্যন্ত এর রহস্যের কিনারা করা যাবে কিনা সন্দেহ!'

'তবু আপনার উপর সবার আস্থা আছে। দৈনিক জনবার্তা তো প্রতিদিন আপনার অতীতের আশ্চর্য সব রহস্যভেদের কাহিনি প্রকাশ করে চলেছে। এখানকার পুলিশ কর্মকর্তারাও আপনার উপর ভরসা করে আছে। আপনি নিশ্চয় সবাইকে নিরাশ করবেন না?'

'আমার চেষ্টার কোন ত্রুটি হবে না; তবে আততায়ীকে পাকড়াও করতে পারব কিনা জানি না।'

'কাউকে কি সন্দেহ হয় আপনার?'

'হলেও এ মুহূর্তে তা বলা উচিত হবে না।'

'আমার অ্যালিবাইতে নিশ্চয়ই কোন ফাঁক নেই, কি বলেন?' হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করল হোবার্ট।

'সবার অ্যালিবাই-ই পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। সেদিক দিয়ে বিচার করলে সবাইকে নির্দোষ বলে রায় দিতে হয়। কিন্তু এখানে অ্যালিবাইটা বড় কথা নয়। বিভিন্ন দৃষ্টি কোণ থেকে পুরো ব্যাপারটা বিচার করতে হবে আমাদের। এবারে একটা কথার জবাব দিন তো, লিজার ব্যাপারে আপনার কি কোনরকম দুর্বলতা আছে?'

চেহারাটা রক্তিম হয়ে উঠল নাবিকের। 'লিজাকে আমি বরাবরই পছন্দ করি। সরাসরি না হলেও আকারে-ইঙ্গিতে কথাটা ওকে জানিয়েছিলাম। কিন্তু মনে হয়, ও কোন একজনের সঙ্গে জীবনকে জড়ানোর চেয়ে নিত্য নতুন বয়ফ্রেণ্ডের সঙ্গ বেশি পছন্দ করে।'

'কিন্তু, শুনেছেন বোধহয়, রবার্টের বাগদত্তা ছিল ও।'

'ও, কথাটা তা হলে সত্যি! অবশ্য এলির মৃত্যুর দিন দুয়েক আগে কথায় কথায় লিজা বলেছিল ও নাকি কোন একজনের বাগদত্তা। এর বেশি আর কিছু বলেনি, আমিও জানতে চাইনি।'

'রবার্টের বিরাট সম্পত্তির মালিক এখন লিজা,' বলল আসাদ, 'এখনই ওকে যে খুন করতে চাইবে সে একটা আস্ত গর্দভ। আর হ্যাঁ, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সবকিছুই বদলে যায়। লিজাও ভবিষ্যতে কখনো আর কারো সঙ্গে নিজেকে জড়াবে না তা কে বলতে পারে!'

কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল হোবার্ট, এমন সময় আবার টোকা পড়ল দরজায়-এবারে রিয়া। হোবার্টকে দেখতে পেয়ে ঝাঁঝের সঙ্গে বলে উঠল ও, 'সারা সকাল থেকে খুঁজে বেড়াচ্ছি, আর তুমি কিনা এখানে! আমার ঘড়িটার কি করলে, যেটা সারাতে দিয়েছিলাম?'

'এই তো, ' পকেট থেকে বেঢপ সাইজের একটা হাতঘড়ি বের করে রিয়াকে দিল হোবার্ট। 'কালই দোকান থেকে ডেলিভারি নিয়েছি; কিন্তু তোমার সঙ্গে দেখা হয়নি-জিনিসটা তাই পকেটে পকেটেই ঘুরছে কাল থেকে।'

বেঢপ সাইজের ঘড়িটা রিয়ার হাতে কেমন যেন বেমানান লাগছে। আজকাল ইলেকট্রনিক ঘড়ির দাপটে এগুলোর চল তেমন একটা নেই। ফ্যাশন হিসেবে আবার নতুন করে ফিরে আসছে কিনা কে জানে! হঠাৎই মনে পড়ল, লিজাও এরকম একটা ঘড়ি ব্যবহার করে।

আসাদের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল রিয়া, 'কি ব্যাপার! কোন গোপন শলা-পরামর্শ হচ্ছিল বুঝি? এসে বিরক্ত করলাম না তো?'

'মোটেই না, বরং প্রভাতী আড্ডাটা আরও জমজমাট হলো। বসুন না! বলছিলাম, খবর কত তাড়াতাড়ি ছড়ায়। রবার্টের সঙ্গে লিজার বাগদানের কথাটা শুনেছেন বোধহয়।'

দু-চোখ যেন কপালে উঠল রিয়ার। ওর মনের ভাব বুঝতে পেরে আসাদ বলল, 'মনে হচ্ছে কথাটা শুনে বেশ অবাক হয়েছেন আপনি?'

'না, ঠিক তা নয়। বছর দেড়েক থেকেই ওদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। কিন্তু শেষবার যখন ওদের একসঙ্গে দেখি, তখন মনে হচ্ছিল সবকিছু বোধহয় চুকেবুকে গেছে, দুজনের মধ্যে কেমন যেন ছাড়াছাড়া একটা ভাব।'

'স্বাভাবিক। ব্যাপারটা ওরা আগাগোড়াই গোপন রাখতে চেয়েছিল রবার্টের দাদার ভয়ে। উনি একথা জানতে পারলে ওকে আর আস্ত রাখতেন না। একটা কথা ভেবে সত্যি ভীষণ অবাক হচ্ছি। আপনি লিজার এত

ঘনিষ্ঠ বান্ধবী হয়েও কথাটা আগে শোনেননি সত্যি অবাক কাণ্ড!'

'ওকে বোঝা বড় শক্ত,' মন্তব্য করল রিয়া, 'এমনিতে খোলামেলা স্বভাবের হলেও কিছু ব্যাপারে সাংঘাতিক চাপা...'

হঠাৎ টেবিলে রাখা কাগজটার উপর চোখ পড়তেই চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেল ওর। মূর্ছা যাওয়া রোগীর মত ঘেমে উঠেছে ও। দু-হাতে দিয়ে মুখ ঢাকল তাড়াতাড়ি।

'কী ব্যাপার! শরীর খারাপ লাগছে? পানি দেব?'

'না, না, কিছু হয়নি আমার,' আসাদকে আশ্বস্ত করল ও, 'হঠাৎ মাথাটা কেমন চক্কর দিয়ে উঠেছিল। যাক, এবারে বলুন, হত্যারহস্যের কতদূর কি হলো? নতুন কোন সূত্র পেলেন?'

'নাহ্, তদন্তের অগ্রগতি তেমন কিছুই হয়নি। আর নতুন যে সমস্ত সূত্র পাওয়া গেছে তদন্তের ব্যাপারে সেগুলো খুব একটা কাজে লাগবে বলে মনে হয় না।'

'তবু...।'

'হ্যাঁ, যেটুকু এগিয়েছি তাতে বলতে পারি, খুনটা বাইরের কারো মাধ্যমে হয়নি। খুনী আমাদের পরিচিতের মধ্যেই একজন।'

'আপনি কি এ ব্যাপারে কাউকে সন্দেহ করছেন?'

'হ্যাঁ, জনা দুয়েকের নাম আমাদের সন্দেহ তালিকার শীর্ষে আছে–কিন্তু একেবারে নিশ্চিত না হয়ে কোনকিছু বলা উচিত হবে না।'

আসাদের কথায় রিয়া কি বুঝল কে জানে! হঠাৎ উঠে দাঁড়াল, 'চলি তা হলে' গটগট করে হেঁটে চলে গেল ও।

'মেয়েমানুষের মেজাজমর্জি বোঝা বড় কঠিন। এই ভাল তো এই খারাপ,' মন্তব্য করল হোবার্ট। 'আপনারা কি এখন বাইরে বেরোবেন?'

'হ্যাঁ, টুকিটাকি কিছু জিনিস কিনতে হবে। অসুবিধা না থাকলে আপনিও চলুন না আমাদের সাথে!'

'না, অসুবিধা কিসের! বরং গল্পেসল্পে ভালই কেটে যাবে সময়টা।

হোটেল থেকে বেরিয়ে একটা ফুলের দোকান থেকে লিজার জন্য কিছু ফুল কিনল আসাদ। 'ভাবছি, ওর জন্য কিছু ফলমূল পাঠালে মন্দ হয় না,' হোবার্ট বলল।

'না, কোন খাবার জিনিস ওকে পাঠানো চলবে না,' আসাদ কঠিন কণ্ঠে বলল।

'আশ্চর্য! আপনি কি এখনো কোন অঘটন ঘটার আশঙ্কা করছেন নাকি?'

'এ কথার কোন উত্তর দিল না আসাদ। পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে তাতে খসখস করে লিখল, "প্রীতি ও শুভেচ্ছাসহ আসাদ রহমান"। কার্ডটা দোকানদারের হাতে দিল। ওদের হোম সার্ভিসের মাধ্যমে কিছুক্ষণের মধ্যেই তোড়াটা প্রাপকের কাছে পৌঁছে যাবে।

পরদিন সকালে দেখা হলো এলির বাবা-মা'র সঙ্গে। ওঁরা লাশ নিয়ে কিছুক্ষণ পর চট্টগ্রাম রওনা হবেন। এ ক'দিন পুলিশী ঝামেলার জন্য লাশ হস্তান্তর করা যায়নি। কথা হচ্ছিল ওঁদের সঙ্গে। আমতা আমতা করে আসাদ বলল, 'সত্যি কথা বলতে কি, আপনাদের সান্ত্বনা দেয়ার ভাষা জানা নেই আমার। তবু অনুরোধ করব, কষ্ট হলেও মনকে এসময় শান্ত রাখুন। নইলে ওপার থেকে এলির আত্মা কষ্ট পাবে।'

'ঠিকই বলেছেন, আপনি। হাজার বিলাপ করলেও এলি তো আর ফিরে আসবে না। আপনি তো শুনেছি নামজাদা ডিটেকটিভ। খুনী কি ধরা পড়বে বলে মনে হয়?'

'আমি চেষ্টার কোন ত্রুটি করব না।'

'ধরা না পড়লেও আফসোস নেই। কারণ আমি বিশ্বাস করি, অন্যায়কারী শাস্তি পাবেই–তা প্রত্যক্ষ ভাবে হোক আর পরোক্ষ ভাবেই হোক।'

'ঠিক,' সায় দিল আসাদ, 'অন্যায়কারী শাস্তি পাবেই। তবে কখনো কখনো জনতার আদালত সে ফাঁকি দিতে পারলেও ঈশ্বরের আদালতে প্রাপ্য শাস্তি ঠিক ঠিকই তাকে মাথা পেতে নিতে হবে।'

'যাক, এবারে বলুন আমাদের লিজা মামণি কেমন আছে–শুনলাম কাউকেই নাকি দেখা করতে দিচ্ছে না?'

'এমনিতে ভালই আছে। তবে মানসিক দিক দিয়ে কিছুটা বিপর্যস্ত। ওর ধারণা এলি খুন হওয়ার জন্য ও-ই দায়ী। এসময় ওর দরকার পুরোপুরি বিশ্রাম। আর তাই ওর সঙ্গে কাউকেই দেখা করতে দিচ্ছে না কর্তৃপক্ষ।'

'তাই বলে নিকট-আত্মীয়রাও দেখা করতে পারবে না?'

'নার্সিং হোমের নিয়মকানুন বেশ কড়া। ওখানকার কর্তৃপক্ষ চান না, রোগী নিয়ে তাদের কোন ঝামেলায় পড়তে হোক। অবশ্য খুব শিগ্‌গিরই হয়তো ওখান থেকে ছাড়া পেয়ে যাবে লিজা। অনেকদিন ওর সঙ্গে আপনাদের দেখা নেই নিশ্চয়ই?'

'হ্যাঁ, অনেকদিন,' উত্তর দিলেন এলির মা, 'গত বছর শীতের আগে আগে ও চট্টগ্রাম গিয়েছিল এলির সঙ্গে দেখা করার জন্য। সাথে রবার্ট

নামের সেই বাউণ্ডুলে ছোকরাটাও ছিল। আসলে কি জানেন, লিজা এমনিতে মেয়ে হিসেবে খারাপ নয়। তবে বন্ধু-বান্ধবের পাল্লায় পড়ে ইদানীং বখে গেছে ও। আর ওকেই বা দোষ দিয়ে লাভ কি, একে তো বাপ-মা হারা, তার উপর নেই কোন অভিভাবক।'

'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন। এ বয়েসে মেয়েদের বিশেষ করে, কোন অভিভাবক না থাকলে কিছুটা বখে যাওয়াই স্বাভাবিক,' সায় দিয়ে বলল আসাদ।

'আরি বাড়িটাও কেমন যেন ভূতুড়ে। লিজার ঐ বাড়িতে থাকাটা একদম পছন্দ হয় না আমার।'

'আপনারা কফিন নিয়ে রওনা হচ্ছেন?'

'দুপুরের পরপরই রওনা হব ভাবছি,' লিজার বাবা জবাব দিলেন।

ওঁদের সঙ্গে আরও কিছু কথাবার্তার পর সোজা থানায় গেলাম আমরা। কিছুক্ষণ পরই চট্টগ্রাম রওনা হতে হবে আমাদের। রবার্ট সিনহার আইন উপদেষ্টার সঙ্গে দেখা করে জানতে হবে, আসলেই ও গ্লাইডার অভিযানের আগে কোন উইল করে গেছে কিনা।

থানায় পৌঁছে দেখি জীপ তৈরি। জাফর অবশ্য কি একটা কাজে আগেই চট্টগ্রাম রওনা হয়ে গেছে। আমরা চট্টগ্রামে পৌঁছে হাতের কাজ সেরে একটা নির্দিষ্ট স্থানে ওর সঙ্গে দেখা করব। আসাদ কিছু তথ্য জানতে চেয়েছে সেগুলো ও চট্টগ্রাম পৌঁছেই আগেভাগে জেনে রাখবে। ওর সহকারীর কাছে উইল দেখার ব্যাপারে একটা অনুমতিপত্র, যা ও আমাদের জন্য আগেই রেখে গিয়েছিল, সেটা নিয়ে আর দেরি না করে চট্টগ্রামের উদ্দেশে রওনা দিলাম।

আগ্রাবাদ বাণিজ্যিক এলাকায় মেসার্স পিটার সরকার অ্যাণ্ড কোং-এর অফিস। কোং- এর অফিস। রবার্টের সলিসিটর। অফিসে ঢুকে মি. সরকারের সঙ্গে পরিচিত হলাম আমরা। পকেট থেকে অনুমতিপত্রটা বের করে তার হাতে দিল আসাদ। ওটায় বার দুই চোখ বুলিয়ে মি. সরকার বললেন, 'আসলে কি, জানেন, মক্কেলদের অনেক রকম সেবা আমাদের করতে হয়। তার একটা হচ্ছে, মক্কেলের দেয়া যাবতীয় তথ্যাদি গোপন রাখা। আর এসব ক্ষেত্রে সরকারের উচ্চপর্যায়ের তদন্ত কমিটির মাধ্যমে মক্কেল সম্বন্ধে কোন তথ্য চাওয়াটাও সচরাচর ঘটে না।'

'সেক্ষেত্রে,' খুক্‌খুক্ করে একটু কেশে নিল আসাদ, 'বলতে বাধ্য হচ্ছি, মক্কেলের অপঘাতে মৃত্যুও কিন্তু খুব বেশি একটা ঘটে না।'

এরপর পুরো ঘটনাটাই মি. সরকারের কাছে বর্ণনা করল আসাদ। সব

শুনে মন্তব্য করলেন তিনি, 'কিন্তু একটা ব্যাপার কিছুতেই মাথায় ঢুকছে না; কক্সবাজারের সেই খুনের সঙ্গে আমার নিখোঁজ মক্কেলের যোগসূত্রটা কোথায়!'

'হ্যাঁ, এবারে সেটাই খোলাসা করছি। কিন্তু তার আগে বলুন তো, আপনার কোম্পানি কতদিন ধরে রবার্টদের সলিসিটার হিসেবে কাজ করছে?'

'রবার্টে দাদার আমল থেকেই আমরা ওদের আইন উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করে আসছি।'

'বেশ, এবারে বলুন, রবার্টের দাদা ফিলিপ সিনহা মৃত্যুর আগে উইল করে গিয়েছিলেন নিশ্চয়ই?'

'হ্যাঁ,' সংক্ষিপ্ত উত্তর মি. সরকারের।

'সেই উইলে উনি সম্পত্তির বাটোয়ারা কিভাবে করেছিলেন?'

' ওর পুরো বিষয়-সম্পত্তি কয়েকটা খাতে ভাগ করা। জাতীয় জাদুঘরকে এক চতুর্থাংশ, পাবলিক লাইব্রেরীকেও তাই-বাদবাকি অর্ধেক সম্পত্তি তিনি রবার্টকে দিয়ে গিয়েছেন।'

'সেই সম্পত্তি পরিমাণে কি খুবই বেশি?'

'হ্যাঁ। একটা কথা মনে রাখতে হবে, ফিলিপ সিনহা দেশের হাতে গোনা কয়েকজন ধনীদের একজন ছিলেন।'

'শোনা যায়,' একটু ইতস্তত করল আসাদ, 'উনি নাকি একটু খেপাটে স্বভাবের ছিলেন?'

স্পষ্ট বিরক্তি প্রকাশ পেলো মি. সরকারের চেহারায়। 'একজন ধনকুবেরের একটু আধটু খেপাটে হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়।'

'হঠাৎই উনি মারা গেলেন, তাই না?' কথার মোড় অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিল আসাদ।

'হ্যাঁ, একেবারে হঠাৎ। পেটে একটা টিউমার হয়েছিল। সেটা দিনকে দিন বিপজ্জনকভাবে বড় হয়ে উঠছিল। তাই অপারেশনটা জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ডাক্তারদের ভাষায় "সফল অস্ত্রোপ্রচার", কিন্তু তবু তিনি মারা গেলেন।'

'তা হলে দাঁড়াচ্ছে এই-ফিলিপ সিনহা মারা যাবার পর তাঁর অর্ধেক সম্পত্তি পেয়েছে রবার্ট। আচ্ছা, গ্লাইডার অভিযানে বেরুনোর আগে ও কি কোন উইল করে গিয়েছিল?'

'হ্যাঁ।'

'সেটা কি আইনসিদ্ধভাবে করা হয়েছে?'

'অবশ্যই,' জোর দিয়ে বললেন মি. সরকার, 'উইলকারীর ইচ্ছা সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে। এ ছাড়া নিয়মমাফিক সাক্ষীর সইও আছে।'

'তবু, মনে হচ্ছে, উইলটাকে মনে মনে অনুমোদন করতে পারছেন না, আপনি?' বোধহয় সলিসিটরের প্রতিক্রিয়া দেখার জন্যেই বলল আসাদ।

কড়া দৃষ্টিতে আসাদের দিকে চাইলেন মি. সরকার। 'মি. রহমান, আমাদের কাজই হলো মক্কেলের মর্জিমাফিক আইনগত সমস্যাদির সুরাহা করা। আমরা সবকিছু আইনের দৃষ্টি কোণ থেকে বিচার করি। এ কথা সত্যি যে, রবার্ট তার দাদার কাছ থেকে সামান্যই মাসোহারা পেত, উপরন্তু নিজের সম্পত্তি বলে কিছু ছিল না তার। হয়তো সে বুঝতে পেরেছিল, ঐ অভিযানে অঘটন কিছু ঘটলেও ঘটতে পারে। নইলে তার মত মানুষের উইল করার কোন প্রয়োজন ছিল না।'

'যদি আপনার আপত্তি না থাকে তা হলে রবার্টের উইলের বিষয়বস্তুও সংক্ষেপে জানতে চাই।'

'না, না, আপত্তি কিসের! ওর উইলের বিষয়বস্তু খুবই সহজ। উইলে সমস্ত সম্পত্তি তার বাগদত্তা, বিখ্যাত মাইকেল গোমেজের পৌত্রী এলিজাবেথ গোমেজের নামে লিখে দেয়া হয়েছে।'

'তা হলে লিজা সত্যিসত্যিই রবার্টের সম্পত্তির মালিক হচ্ছে?'

'নিঃসন্দেহে!'

'আচ্ছা, ঘটনাচক্রে ঐদিন যদি লিজা মারা যেত তা হলে অবস্থা কি দাঁড়াত?'

একটু কেশে নিয়ে বলতে আরম্ভ করলেন মি. সরকার, 'ধরে নিই, ঐদিন লিজার মৃত্যু হয়েছে। সেক্ষেত্রে রবার্টের ওয়ারিস হিসেবে রবার্টের সম্পত্তি চলে আসবে লিজার নামে। আর লিজার মৃত্যুর পর তার উইলে ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের নামে চলে যাবে লিজার সম্পত্তি। আর যদি উইল করা না থাকে তবে আইন অনুসারে তা নিকট-আত্মীয় কিংবা আত্মীয়দের মধ্যে ভাগাভাগি হবে।'

'অনেক ধন্যবাদ, মি. সরকার।' করমর্দন করে জীপে উঠলাম আমরা।

সদরঘাটের কাছে হোটেল শাহজাহানে এসে থামল জীপ। কথামত জাফর আগে থেকেই সেখানে অপেক্ষা করছিল। আমরা তিনজন নিরিবিলি একটু জায়গা বেছে নিয়ে বসে পড়লাম। বেয়ারাকে খাবারের অর্ডার দিল জাফর।

খেতে খেতে কথা হচ্ছিল। বেশির ভাগই পুরনো দিনের স্মৃতিচারণ। কথায় কথায় মন্তব্য করল জাফর, 'একটা সময় আসে, যখন পুরনোদের

সরে গিয়ে নতুনদের জায়গা করে দিতে হয়।'

'কিন্তু নতুনদের মধ্যে সেরকম কেউ আসছে কই? অপরাধ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কত যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে গেছে ভাবতেও অবাক লাগে। অপরাধীকে সনাক্ত করার জন্য বিভিন্ন কমপিউটারাইজ যন্ত্রপাতিও ব্যবহৃত হচ্ছে আজকাল। কিন্তু সে তুলনায় আমাদের পর আর তেমন উল্লেখযোগ্য কেউ কি এসেছে?' খেদের সুরে বলল আসাদ। 'মাঝেমধ্যে ইচ্ছে হয়, অবসর নিয়ে বাকি জীবনটা শান্তিতে কাটিয়ে দিই। কিন্তু, পারছি কই, বলো? ঐ যে কথায় বলে, ঢেঁকি স্বর্গে গিয়েও ধান ভানে। আমার অবস্থাও হয়েছে তাই। এলাম হাওয়া বদল করতে, জড়িয়ে পড়লাম খুনের রহস্যে। কিন্তু কই, এমন একজন নতুন প্রতিভার খোঁজ দাও দেখি আসাদ রহমানের পরিবর্তে সে এসে হত্যা রহস্যের কিনারা করে দিয়ে যাক!' ওর কথার উত্তরে হাসতে হাসতে মন্তব্য করল জাফর, 'হাতি মরলেও লাখ টাকা, আর আসাদ রহমান বুড়ো হলেও এখনো গোয়েন্দাদের সেরা।'

তোষামুদে কথার কাজ হলো। আসাদের আত্মপ্রচার থেমে গিয়ে আলোচনার মোড় ঘুরে গেল অন্যদিকে। 'এবারে কাজের কথায় আসা যাক,' বলল জাফর, 'প্রথমে ফিরোজের কথায় আসি। যদিও ইদানীং বিভিন্ন কারণে ব্যবসায়ে কিছুটা মন্দা যাচ্ছে, তবু ব্যবসায়ী হিসেবে বাজারে ওর এবং ওর বাবার যথেষ্ট সুনাম আছে। দ্বিতীয়ত, 'ডা. কমল রডরিক্স সম্বন্ধে বিস্তারিত খোঁজ নিয়েছি। উনি গাইনির ডাক্তার। নিজ পেশায় যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন, এ ছাড়া কোন রকম পেশাগত ছলচাতুরির রিপোর্ট তাঁর বিরুদ্ধে নেই।'

একটু অবাকই হলাম। ডা. কমল রডরিক্সের সঙ্গে আমাদের এই ঘটনার সম্পর্কে কি?'

'সম্পর্ক আছে–ভদ্রলোক ক্যাপ্টেন হোবার্টের দূর সম্পর্কের মামা।'

'তবে কি...তবে কি ফিলিপ সিনহার অপারেশন এই ভদ্রলোকই করেছেন?'

'না, মি. রডরিক্স সার্জন নন।'

'আচ্ছা, ঐ হাতের ছাপের ব্যাপারে কি কিছু জানতে পেরেছ?'

'না, আমাদের রেকর্ড বুকে তন্নতন্ন করে খুঁজেও কিছু পাওয়া গেল না। তবে এ ব্যাপারে আরও অনুসন্ধান চালিয়ে যাবার জন্য থানা কর্তৃপক্ষকে বলেছি। আশা আছে, খুব শিগরিই হয়তো নতুন কিছু জানা যাবে।'

'তুমি, দোস্ত, আসলেই একটা জিনিয়াস,' জাফরের পিঠ চাপড়ে বলল আসাদ, 'এই খুনের কিনারা করার ব্যাপারে তোমার সাহায্য না পেলে

অন্ধকারেই হাতড়ে মরতে হত আমাকে।'

আরও নানারকম কথাবার্তা হলো। একসময় সূর্যটা পশ্চিমে হেলে পড়ল। কক্সবাজারের পথে রওনা হলাম আমরা।

পৌঁছতে পৌঁছতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। হোটেলে আমাদের নামিয়ে দিয়ে জীপ নিয়ে চলে গেল জাফর। হোটেলের কাউন্টারে একটা চিরকুট পাওয়া গেল। সেটা পাঠিয়েছেন ডা. লতিফ শিকদার। বিশেষ জরুরি প্রয়োজনে আসাদকে টেলিফোনে যোগাযোগ করতে বলেছেন তিনি। দেরি না করে শর্মিলা নার্সিং হোমে টেলিফোন করে ডা. শিকদারকে চাইল আসাদ। মিনিটখানেকের মধ্যেই ওপাশ থেকে ডাক্তারের কণ্ঠ শোনা গেল। একটু পর লক্ষ্য করলাম, চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে আসাদের।

'কি? কি বললেন?' হাত থেকে রিসিভারটা পড়ে যাচ্ছিল প্রায়। চট্ করে সেটা ধরে ফেললাম; আসাদও ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছে। ধপ্ করে পাশের চেয়ারটায় বসে পড়ল ও। আরও মিনিটখানেক পর রিসিভার নামিয়ে রাখল। লক্ষ্য করলাম, ওর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই বলতে শুরু করল ও, 'মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছে লিজা। এবারে কোকেন পয়জনিং। উহ্ চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে হচ্ছে আমার। নার্সিং হোমের উপর ওর নিরাপত্তার দায়িত্ব পুরোপুরি ছেড়ে দেয়া মোটেই উচিত হয়নি।'

আর কথা না বাড়িয়ে নার্সিং হোমের দিকে পা বাড়ালাম আমরা।

আট

নার্সিং হোমে পৌঁছে ডা. শিকদারকে দেখতে পেলাম। এ ঘটনায় কিছুটা মুষড়ে পড়েছেন ভদ্রলোক।

'লিজার অবস্থা কি খুবই খারাপ? মানে.... ।'

'না, না, এখন আর ভয়ের কিছু নেই। সময়মত চোখে পড়েছিল বলেই অল্পের ওপর দিয়ে কেটে গেল বিপদটা,' আসাদকে আশ্বস্ত করলেন ডা. শিকদার।

'কিন্তু ভেবেই পাচ্ছি না, এত কড়া পাহারার ব্যবস্থা থাকার পরেও আততায়ী এখানে ঢোকার সুযোগ পেল কি করে?'

'দারোয়ান এবং নার্সরা কিন্তু বলছে কাউকেই ঢুকতে দেয়া হয়নি।'

'ওরা ওরকম বলেই থাকে। ভালভাবে জেরা করলেই সত্যি কথাটা বেরিয়ে আসবে।'

'আসলে এই অঘটনাটা ঘটেছে বাইরে থেকে পাঠানো চকোলেট খেয়ে। ওগুলোতে কোকেন মেশানো ছিল।'

'আশ্চর্য! এতটা অবুঝ হলে চলবে কী করে? বাইরের কোন জিনিস খাওয়া চলবে না, একথা তো বারবার বলেছি ওকে। যাক, সবগুলো চকোলেটেই কি কোকেন মেশানো ছিল?'

'না, মাত্র তিনটেই। ভাগ্য ভাল যে, ও খেয়েছে মাত্র একটা।'

'আততায়ী চকোলেটে কোকেন মেশালো কিভাবে?'

'খুবই সহজ উপায়ে। চকোলেটগুলো মাঝবরাবর ধারাল কিছু দিয়ে কেটে ভেতরের পুর খানিকটা ফেলে দিয়ে সে জায়গায় কোকেন ভরে দুটো অংশ আবার আগের মত জুড়ে দেয়া হয়েছে। একেবারে আনারি হাতের কাজ–লক্ষ্য করলে যে কেউ বুঝতে পারবে।'

'লিজার সঙ্গে কি এখন দেখা করা যাবে?'

'ইয়ে, মানে...' ইতস্তত করে বললেন ডা. শিকদার, 'এই মাত্র ওর

জ্ঞান ফিরেছে। কিছুক্ষণ পর দেখা করলে ভাল হয়।'

আর কথা না বাড়িয়ে সী–বীচের দিকে হাঁটতে শুরু করলাম আমরা। ঘণ্টাখানেক পর আবার নার্সিং হোমে যাব।

সেই সন্ধ্যে থেকেই গুম হয়ে আছে আসাদ। এর মধ্যে দুই-একবার কথা বলার চেষ্টা করেও ওর মুখ থেকে কোন কথা বের করতে পারিনি। সাগর সৈকতে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে হেঁটে চলেছি আমরা। সমুদ্র এখন বেশ শান্ত। দূরে ছোট ছোট ডিঙি নৌকা কিংবা সাম্পানের আলো দেখা যাচ্ছে। চাঁদের আলো সমুদ্রের পানিতে বিচ্ছুরিত হয়ে রেশমী এক চাদরের আচ্ছাদন সৃষ্টি করেছে যেন। বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দের মাঝে কেমন একটা মাদকতার আভাস, যেন পরিতৃপ্তির অবসাদ ছড়িয়ে দিচ্ছে সারা শরীরে।

আবার নার্সিং হোমের পথ ধরলাম।

ডা. শিকদার তাঁর ডিউটি শেষ করে ফিরে গেছেন। অবশ্য নার্সদের বলে রেখেছিলেন, তাই কোন অসুবিধা হলো না। ওদের একজন লিজার কেবিনে পৌঁছে দিল আমাদের। ভেতরে ঢুকলাম। পাতলা একটা চাদর গায়ে দিয়ে আধশোয়া অবস্থায় বসে রয়েছে ও। চোখমুখ ফ্যাকাশে। 'দেখা যাচ্ছে, নার্সিং হোমও তা হলে নিরাপদ নয়,' বিপর্যস্ত চেহারায় জোর করে হাসি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করল লিজা। কিন্তু চেহারাটা কেমন যেন কান্নামাখা দেখাচ্ছে ওর।

'নার্সিং হোম নিরাপদ ঠিকই, কিন্তু এখানেও কিছু বিধিনিষেধ মেনে চলার আছে। আপনাকে বারংবার বলা সত্ত্বেও সেগুলো মনে চলেননি। আততায়ী সেই সুযোগটাই আবার কাজে লাগিয়েছে।'

'কিন্তু আমি তো কোন বিধিনিষেধ অমান্য করিনি। এমন কি, আপনার কথামত ভুলেও কেবিনের বাইরে যাচ্ছি না। এর পরেও কি বলবেন আমি বিধিনিষেধ মেনে চলিনি?'

'আপনাকে কি বলিনি, বাইরে থেকে পাঠানো কোন জিনিস মুখে দেয়া চলবে না?'

'হ্যাঁ, বলেছেন... ।'

'তবু, আপনি বাইরে থেকে পাঠানো চকোলেট খেয়েছেন!'

'কিন্তু ওগুলোতে যে কোকেন মেশানো আছে তা জানবো কেমন করে? কারণ চকোলেটগুলো তো পাঠিয়েছেন আপনিই!'

'কি? কি বললেন?'

'হ্যাঁ, চকোলেটগুলো তো আপনারই পাঠানো!'

'অসম্ভব! আপনার জন্য আমি চকোলেট পাঠাইনি।'

'তা কি করে হয়? বাক্সে তো আপনার সই করা কার্ড সাঁটা ছিল।'

'কী? আমার কার্ড সাঁটা ছিল ওই চকোলেটের বাক্সে?'

ইশারায় নার্সকে পাশের টেবিল থেকে বাক্সটা নিয়ে আসতে বলল লিজা। বাক্সটা আসাদের সামনে এনে রাখল সে। বাক্সে আসাদের স্বাক্ষর করা কার্ড সাঁটা! ঠিক এরকম আরেকটা গায়ে সেঁটে দিয়েছিল আসাদ। মুখে কোন কথা নেই ওর। শুধু ওর কেন, আমারও একই অবস্থা–বিস্ময়ে যেন বোবা বনে গেছি আমরা।

'আততায়ী একটা জিনিয়াস,' মুখে কথা ফুটল আসাদের 'কত সহজ, কিন্তু কি নিখুঁত পরিকল্পনা! ছোট একটা কার্ড তাতে লেখা প্রীতি ও শুভেচ্ছাসহ, আর নিচে আমার সই। ব্যস, কেল্লা ফতে। গুলিগোলার ঝামেলা নেই। কোনরকম খাটাখাটুনিও নেই, কিন্তু কাজ হাসিল। প্রতিপক্ষ আমাদের চেয়ে অ–নেক বেশি চালাক।'

'এবারে ওর শুয়ে পড়া উচিত,' চোখেমুখে বিরক্তি প্রকাশ করে বলল নার্স। অনেকক্ষণ ধরেই উসখুস করছিল সে। আমাদের দেরি দেখে কথাটা মুখ ফুটে বলেই ফেলল সে।

লিজার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিচে এলাম আমরা। সাধারণত চিঠি পার্সেল এবং রোগীর জন্য পাঠানো জিনিসপত্র যে পিয়নটা তদারকি করে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে শুরু করল আসাদ, 'আচ্ছা, বলো তো, চকোলেটের প্যাকেটটা লিজার কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য কে তোমাকে দিয়েছিল?'

'এক ভদ্রলোক। লম্বা–চওড়া দেখতে। উনি বিকেলের দিকে গাড়ি করে এসে প্যাকেটটা দিয়ে গিয়েছিলেন।'

'মনে হচ্ছে অ্যালবার্ট,' বলেই নিজের বোকামিটা বুঝতে পারলাম, অপরিচিত একজনের সামনে এভাবে নাম বলাটা ঠিক হয়নি।

কিন্তু ততক্ষণে কথাটা শুনে ফেলেছে সে। বলল, 'না, উনি না। ওনাকে আমি চিনি। এই ভদ্রলোক তো আরও একটু লম্বা।'

'তা হলে নিশ্চয়ই ফিরোজ,' এবারেও মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল। আসাদের কড়া চাহনি দেখে সতর্ক হয়ে গেলাম।

'ভদ্রলোক কোন্ সময় প্যাকেটটা দিয়ে গিয়েছিলেন?'

'সময়টা নির্দিষ্ট করে বলতে পারব না। মনে হয়, বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে।'

'প্যাকেটটা আমি নিইনি, স্যার। নার্সই সেটা উপরে নিয়ে গিয়েছিল।'

'তা বুঝলাম, কিন্তু ভদ্রলোকের হাত থেকে ওটা তো তুমিই নিয়েছিলে,

তাই না?'

'জ্বি। কিন্তু প্যাকেটটা ওনার হাত থেকে নিয়ে পাশের হলরুমের বড় টেবিলের রেখেছিলাম।'

'বেশ। কোথায় সেই টেবিল?'

পাশের হলরুমে ঢুকলাম আমরা। সেখানে বড় একটা শ্বেত-পাথরের টেবিল। রোগীদের আত্মীয় স্বজনেরা যে সমস্ত জিনিসপত্র পাঠায় সেগুলো এখানে জমা করা হয়।

'আচ্ছা, বলতে পারো, প্যাকেটটা ঠিক ক'টার সময় লিজার কেবিনে পাঠানো হয়েছিল?'

'তখন সন্ধ্যা প্রায় ছ'টা,' মাথা চুলকে বলল লোকটা।

'ঠিক আছে। তুমি এখন যাও, আর যার হাত দিয়ে প্যাকেটটা লিজার কেবিনে পৌঁছেছে তাকে পাঠিয়ে দাও।'

একটু পর মাঝবয়েসী এক নার্স এল। সে-ই প্যাকটটা লিজার রুমে পৌঁছে দিয়ে এসেছে। তার কাছ থেকে আরও জানা গেল, অনেকেই বিভিন্ন জাতের ফুলের তোড়া আর কেউ কেউ খাবার জিনিসও পাঠিয়েছেন। যেমন ডি কস্টারা পাঠিয়েছেন ঘরে তৈরি পিঠা। এ ছাড়া হুবহু একই রকমের আরও একটা চকোলেটের বাক্স এসেছে। তাতে প্রেরকের নাম নেই। অবশ্য সেটা এসেছে ডাক মারফত।'

'কি, কি বললেন, আরও এক বাক্স চকোলেট?'

'হ্যাঁ, ব্যাপারটা একটু আশ্চর্য ঠেকলেও আসলে ঘটেছে কিন্তু তা-ই। আমি দুটো বাক্সই ওনার কাছে নিয়ে গিয়েছিলাম। উনি চকোলেটের একটা বাক্স রেখে অন্যটা আরও সব বাইরের খাবারের সঙ্গে ফিরিয়ে দিলেন। বললেন, ঐ বাক্সটা আপনি পাঠিয়েছেন–তাই ওগুলো খেতে কোন আপত্তি নেই।'

'আচ্ছা, অন্য বাক্সটা কে পাঠিয়েছিল?'

'তাতে প্রেরকের নাম-ঠিকানা লেখা ছিল না।'

'আর যে বাক্সটা বলা হচ্ছে আমি পাঠিয়েছি, সেটা কিভাবে এসেছে, ডাকে নাকি লোক মারফত?'

একটু ইতস্তত করে বলল নার্স, 'ঠিক মনে পড়ছে না, যদি বলেন তো উপরে গিয়ে মিস গোমেজকে জিজ্ঞেস করে আসতে পারি।'

আসাদ সম্মতি দেয়ায় লিজার কেবিনে গেল নার্স। ফিরে এল আবার মিনিট পাঁচেক পর। 'উনি সঠিক করে কিছুই বলতে পারছেন না। তবে যতটুকু মনে পড়ে তা থেকে উনি বললেন, যে বাক্সটা লোক মারফত

এসেছে সেটাতে আপনার কার্ড ছিল।'

আপাতত জিজ্ঞেস করার মত তেমন কিছু নেই। নার্সকে তাই বিদায় জানিয়ে হোটেলের পথ ধরলাম।

হোটেলের কাছাকাছি এসে পড়েছি, দূরে পার্কিং লনে দেখা গেল ফিরোজের গাড়ি। তাড়াতাড়ি ওদিকেই এগিয়ে গেলাম। গাড়ির বনেটে ঝুঁকে পড়ে কি যেন করছে ফিরোজ। কোনরকম ভণিতা না করে সরাসরি জিজ্ঞেস করল আসাদ, 'আজ সন্ধ্যায় আপনি কি লিজার জন্য এক বাক্স চকোলেট নিয়ে গিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ, কিন্তু তাতে কি হয়েছে?'

'না, কিছু হয়নি। এমনি জিজ্ঞেস করলাম,' হালকাভাবে উত্তর দিল আসাদ।

'চকোলেটের বাক্সটা আসলে রিয়া পাঠিয়েছে। আমি শুধু নার্সিং হোমে পৌঁছে দিয়ে চলে এসেছি।'

'রিয়াকে এখন কোথায় পাওয়া যাবে, বলতে পারেন?'

'হোটেলেই পাবেন। ডাইনিং হলে বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে ডিনার খাচ্ছে।'

ফিরোজের সঙ্গে আর কথা না বাড়িয়ে ভেতরে ঢুকলাম। রিয়াকে দেখা গেল। ডিনার সেরে বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে গল্পে মশগুল। আমরা একটু দূরে কোণের দিকের একটা টেবিল দখল করে বসলাম। ইশারায় ওকে ডাকল আসাদ। কয়েক মিনিট পর ও এল। 'ব্যাপার কি, বলুন তো, কিছুক্ষণ আগে শুনলাম লিজা নাকি সাংঘাতিক অসুস্থ?'

'হ্যাঁ,' গম্ভীর কণ্ঠ আসাদের, 'একটা কথার জবাব দিন তো, আজ বিকেলে আপনি কি লিজার জন্য এক বাক্স চকোলেট পাঠিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ। ও-ই তো পাঠাতে বলল। তাই পাঠিয়েছিলাম।'

'কি বললেন! লিজা আপনাকে চকোলেট পাঠাতে বলেছিল?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু ওর সঙ্গে দেখা হলো কি করে আপনার?'

'আমি দেখা করিনি। ও-ই নার্সিং হোম থেকে টেলিফোন করে চকোলেট পাঠাতে বলেছে।'

বিস্ময় ফুটে উঠল আসাদের চেহারায়। 'লিজা আপনাকে টেলিফোন করেছিল? কি বলল ও টেলিফোনে?'

'ও বলল, আমি যেন আজ বিকেলে ওর জন্য দু-পাউণ্ড চকোলেট পাঠিয়ে দিই।'

'টেলিফোনে ওর গলার স্বর কি রকম শোনাচ্ছিল, ফ্যাঁসফেঁসে?'

'না, তবে কেমন যেন অন্যরকম। প্রথমটায় আমি বুঝতেই পারিনি যে ও কথা বলছে।'

'আপনি কি নিশ্চিত যে টেলিফোনে লিজার গলাই শুনতে পেয়েছেন?'

'আমি, মানে...ঠিক...কিন্তু কেন, ও ছাড়া আর কে-ই বা হবে?'

'প্রশ্ন তো সেখানেই।'

'তার মানে? আপনি কি বলতে চাচ্ছেন...?'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই। তা ছাড়া আপনি নিজেও তো নিশ্চিত নন যে টেলিফোনে লিজাই কথা বলেছে।'

'আচ্ছা, এবারে বলুন তো কি হয়েছে?'

'লিজা সাংঘাতিক ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। ঐ চকোলেটগুলোতে কোকেন মেশানো ছিল।'

'অসম্ভব! এ হতেই পারে না...।'

'অসম্ভব নয়, এটাই সত্যি। আপনার পাঠানো চকোলেট খেয়ে ও এখন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে।'

দুই হাতে মুখ ঢাকল রিয়া। রীতিমত ফোঁপাতে শুরু করল সে। 'না, না, এ কিছুতেই হতে পারে না। অন্য কারোর পাঠানোটা খেয়ে এরকম হলে কথা ছিল না।'

'কিন্তু হয়েছে তো তাই-ই।'

'তা কি করে হয়! আমার পাঠানো বাক্সটা আমি আর ফিরোজ ছাড়া অন্য কেউ ছোঁয়নি। না, না, মি. রহমান, আপনার ভুল হচ্ছে কোথাও।'

'এখানে ভুল হবার কিছু নেই; যদিও আততায়ী বেশ বুদ্ধি খরচ করে আমার নামের একটা কার্ড ঐ বাক্সে সেঁটে দিয়েছিল।'

অবাক চোখে আসাদের দিকে চাইল রিয়া।

'যদি সত্যি সত্যিই লিজার কিছু একটা ঘটে তা হলে কিন্তু–' শাসানোর ভঙ্গিতে তর্জনী তুলে কঠিন দৃষ্টিতে রিয়ার দিকে চাইল আসাদ।

রুমে ফিরে এসে কিছুক্ষণ গুম হয়ে রইল আসাদ। তারপর শুরু হলো ঘরময় অস্থিরভাবে পায়চারি। এদিকে রাত গভীর হয়েছে। শুতে যাব কিনা ভাবছি। হঠাৎ মুখ খুলল ও, 'কিন্তু তা কি করে হয়! রিয়া খুব ভাল করেই জানে, লিজা মারা গেলে কিছু সম্পত্তি ছাড়া পুরোটাই ওর দখলে চলে যাবে। কিন্তু তাই বলে চকোলেটে বিষ মেশানো কিংবা কাল্পনিক টেলিফোনের গল্প ফাঁদার মত কাঁচা মেয়ে সে নয়। এ সবের পেছনে অন্য কোন রহস্য লুকিয়ে আছে। অবশ্য এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে।

রিয়া কোকেনের নেশা করে। ও ভাল করেই জানে, একসঙ্গে কতটা কোকেন নিলে জীবন বিপন্ন হতে পারে। এ ছাড়া ওর ঐ কথাটা "অন্য কারো পাঠানোটা খেয়ে..." আমাকে বেশ ভাবিয়ে তুলেছে। ডাকে যে বাক্সটা এসেছে সে ব্যাপারেও কি ওর হাত আছে?'

'অন্য বাক্সটার ব্যাপারেও ওর হাত থাকা অসম্ভব কিছু নয়। পরিস্থিতি ঘোলাটে করার কৌশল কিনা কে জানে!'

'আর একটা কথা, যদি ওর কাছে কেউ টেলিফোন করেও থাকে তা হলে কণ্ঠস্বরটা কার ছিল? হাবিব, মনে হয় আমরা এখনো গাঢ় অন্ধকারেই হাতড়ে মরছি।'

'প্রভাতের আলো ফুটে বেরুনোর আগেই সবচেয়ে বেশি অন্ধকার থাকে,' আসাদকে শান্ত করার জন্য দার্শনিকের মত মন্তব্য ঝেড়ে দিলাম।

আরও কিছুক্ষণ পায়চারি করার পর ওর চেহারায় এক ধরনের পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। কিছু একটা বলার জন্য মুখ খুলতে যাচ্ছিলাম কিন্তু ইশারায় কথা বলতে নিষেধ করল ও। 'আর একটা কথাও নয়। যদি আমাকে সাহায্য করতে চাও তা হলে জলদি কোথাও থেকে এক প্যাকেট তাস যোগাড় করে আনো।'

ওর এই কথায় অবাক না হয়ে পারলাম না। এত রাতে তাস! তবু কথা না বাড়িয়ে তাসের সন্ধানে নিচে চলে এলাম। মনে হচ্ছে, হঠাৎ করে যেন মাথায় পাগলামি চেপেছে ওর। সবই বয়সের দোষ! অথচ এই আসাদই এক সময় আশ্চর্য সব রহস্যের কিনারা করে দেশজোড়া খ্যাতি অর্জন করেছিল। এক প্যাকেট তাস জোগাড় করে ফিলে এলাম রুমে। সেটা ওর হাতে দিয়ে একটা উপন্যাসে মন বসাতে চেষ্টা করলাম। এমনিতেই চোখ থেকে ঘুম উধাও হয়েছে। বেশি রাত হয়ে গেলে যা হয়। আড়চোখে লক্ষ্য করলাম, সাইড টেবিলে একটার উপর আরেকটা তাস সাজিয়ে ঘর তৈরির খেলায় মগ্ন আসাদ। কোন জটিল সমস্যায় পড়লে মাথা ঠাণ্ডা রাখার এ এক নিজস্ব পদ্ধতি ওর। ওকে বিরক্ত না করে লম্বা হয়ে পড়লাম বিছানায়।

নয়

ভোর সাড়ে পাঁচটার দিকে আসাদের ডাকাডাকিতে ঘুম ভেঙে গেল। ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম। মাথার কাছে ও দাঁড়িয়ে। চেহারায় একটা পরিতৃপ্তির ভাব। হেসে বলল, 'তোমার কথাই ঠিক, প্রভাতের আলো ফুটে বেরুনোর আগেই সবচেয়ে বেশি অন্ধকার থাকে। এ কদিন একেবারেই অন্ধকারে ছিলাম, কিন্তু আজ আলোর মুখ দেখতে পেয়েছি। ও হ্যাঁ, একটা কথা তো তোমাকে বলাই হয়নি,' চোখেমুখে কৌতুক খেলা করছে ওর, 'চকোলেটের বিষক্রিয়ায় লিজার মৃত্যু হয়েছে।'

'কি? লিজার মৃত্যু হয়েছে! উত্তেজনার বশে চিৎকার করে এমনভাবে লাফিয়ে উঠেছিলাম, আসাদ দরে না ফেললে হয়তো মেঝেতেই চিৎপটাং হয়ে পড়তাম।

'চুপ, আস্তে!' কিছু হয়নি লিজার। এতদিন তো আততায়ী আমাদের নিয়ে খেলেছে। এবার আমাদের পালা। মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার জন্য লিজার মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে দিয়ে দেখতে চাই ঘটনায় এটা কি কি পরিবর্তন আনে। হত্যাকারী জানবে, পরপর চারবার ব্যর্থ হওয়ার পর পঞ্চমবারে সে সফল হয়েছে! আমার স্থির বিশ্বাস, চব্বিশ ঘণ্টা পেরুনোর আগেই ঘটনা প্রবাহ নতুন মোড় নেবে। ব্যাপারটা খুবই ইন্টারেস্টিং হবে, কি বলো?'

সকাল হতেই কাজে নেমে পড়ল আসাদ। কিন্তু আমি রুমেই রয়ে গেলাম। শরীরে জ্বরজ্বর বোধ হচ্ছে। কিছুটা বমি বমি ভাবও আছে।

লিজার ব্যাপারে প্রথমেই টেলিফোনে ম্যানেজ করতে হলো ডাক্তার শিকদারকে। তাঁর উপর পুরো নার্সিং হোম সামাল দেয়ার দায়িত্ব দেয়া হলো। এরপর থানায় গিয়ে জাফরের সঙ্গে দেখা করল আসাদ। থানা থেকে সমন জারি করা হলো–পোস্ট মর্টেম ও অন্যান্য আইনগত বিধিনিষেধের কারণে চব্বিশ ঘণ্টার আগে কাউকেই মৃতদেহ দেখতে দেয়া হবে না।

ঘণ্টা দেড়েক পর অল্প কিছুক্ষণের জন্য ফিরে এল আসাদ। বলল, 'লিজার বন্ধু-বান্ধবী থেকে শুরু করে দৈনিক জনবার্তার অফিস পর্যন্ত পৌঁছে গেছে খবরটা। আর মৃতদেহ দেখার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর করা হয়েছে। নার্সিং হোমের গেটে পুলিশ কাউকে ভেতরে ঢুকতে দিচ্ছে না,' হো হো করে হেসে উঠল ও। বোঝা যাচ্ছে, লিজার মৃত্যু সংবাদ রটিয়ে দিয়ে দারুণ মজা পাচ্ছে। 'পথে দেখা হলো রিয়ার সঙ্গে,' আবার বলতে শুরু করল ও, 'বেচারির মুখচোখ ফোলা ফোলা। কোথায় যাচ্ছে, জানতে চাইলে বলল, লিজার স্মৃতির প্রতি শেষ শুভেচ্ছা জানানোর জন্য ফুলের তোড়া কিনতে দোকানে যাচ্ছে। শুনে মাথায় একটা আইডিয়া উঁকি দিল। আমিও এরকম একটা তোড়া পাঠিয়ে দিই না কেন! সেদিনের ঐ তোড়াটায় লেখা ছিল–প্রীতি ও শুভেচ্ছাসহ আসাদ রহমান। আর আজ লিখতে হয়েছে–লিজার পূণ্য স্মৃতির উদ্দেশে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আসাদ রহমান,' আবার একচোট হাসল ও।

'বাহ! এক মিথ্যে নাটক সাজিয়ে বেশ মজা পাচ্ছো বলে মনে হচ্ছে?'

'নাটক বলছ কি! এ-তো রীতিমত এক কৌতুকের পালা। নিজ নিজ চরিত্রে ঠিকমত অভিনয় করতে না পারলে দর্শকের হাততালি জুটবে কি করে? ও হ্যাঁ, লিজাকে আমার পরিকল্পনার কথা জানিয়েছি। পুরো ব্যাপারটায় দারুণ মজা পাচ্ছে–ভুলেও কেবিনের বাইরে পা দেবে না ও।'

'চকোলেটে বিষ মেশানোর ব্যাপারে কাকে বেশি সন্দেহ হয় তোমার?' প্রসঙ্গ পাল্টালাম আমি।

'এ ক্ষেত্রে তিনটে সম্ভাবনার কথা মাথায় উঁকি দিচ্ছে আমার। প্রথমত চকোলেটের বাক্সটা রিয়া ফিরোজের হাত দিয়েই নার্সিং হোমে পাঠিয়ে ছিল। তা হলে ওদের দুজনই, কিংবা দুজনের যে কোন একজন এ ব্যাপারে জড়িত থাকতে পারে। এটা একেবারে সহজ সমাধান।'

'তোমার দ্বিতীয় সমাধানটা কি শুনি!'

'চকোলেটের আরও একটা বাক্স যেটা ডাকে এসেছে ওটা পাঠিয়েছে কে? আমাদের সন্দেহ তালিকার যে কেউ হতে পারে। যদি ঐ বাক্সের চকোলেটে কোকেন মেশানো থাকে তা হলে টেলিফোনের ব্যাপারটা আসলে কি? এখানে এই দ্বিতীয় চকোলেটের বাক্সটা পুরো ঘটনাকে জটিল করে তুলেছে।'

'কিন্তু এতে করে কোন সমাধানে আসা যাচ্ছে না। যাক, তোমার তৃতীয় ব্যাখ্যা বলো।'

'ধরা যাক, ডাকে আসা বাক্সের চকোলেটে কোকেন মেশানো ছিল।

সেটা লিজার কাছে পাঠিয়ে কৌশলে অন্য বাক্সটা সরিয়ে ফেলা হয়েছে। এটাও সন্দেহ তালিকার যে কেউই করে থাকতে পারে। আর যদি তা-ই হয়ে থাকে তা হলে টেলিফোনের কারণটা সহজেই অনুমান করা যায়- রিয়াকে এখানে বলির পাঠা হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।'

'যাই বল, এই চকোলেটের ব্যাপারটা কিন্তু পুরো ঘটনাকে রীতিমত ঘোলাটে করে তুলেছে। যাক এ নিয়ে পরে আর ভাবা যাবে,' চোখ বুজলাম। শরীরে ঝিমুনি ভাব।

'একটা কথা না বলে আর পারছি না,' আসাদের কথায় তন্দ্রা-ভাব কেটে গেল, 'সেই ফুলের দোকানদারের ভাগ্য এই সুযোগে খুলে গেল। আমি তো দিব্য দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি-ডি কস্টা, অ্যালবার্ট, ফিরোজ এরা সবাই লাইন দিয়ে ফুলের তোড়া কিনছে...' আসাদ আর কিছু বলতে গিয়েও বোধহয় থেমে গেল। কারণ ততক্ষণে আবার চোখ বুজেছি আমি-জ্বরটা বেশ বেড়ে উঠছে মনে হয়। আসাদ বাইরে চলে গেল। মোটা একটা কম্বল গায়ে চাপালাম আমি। এরপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না।

ঘুম যখন ভাঙল তখন বিকেল। জ্বর খুব একটা কমেছে বলে মনে হচ্ছে না। দেখলাম, পাশের টেবিলটায় ঝুঁকে পড়ে কি যেন লিখছে আসাদ। আমাকে জেগে উঠতে দেখে ও বলল, 'ক' দিন আগে সন্দেহজনক ব্যক্তিদের তালিকায় যাদের নাম রেখেছিলাম, এখন ওই নামগুলোই নতুন ব্যাখ্যাসহ আবার লিখেছি। পড়ে শোনাবো?'

১. বুয়াঃ ঘটনার দিন প্রতি বছরের মত কেন সে বাজি পোড়ানো দেখার জন্য বাইরে যায়নি? (ব্যাপারটা আসলেই খটকা লাগার মত। কারণ লিজাও কথাটা শুনে বেশ অবাক হয়েছিল)। ঐ দিন কি বাড়িতে ও অপরিচিত কাউকে দেখতে পেয়েছিল, যাকে আমরা এ ঘটনায় "অজ্ঞাত ব্যক্তি" হিসেবে চিহ্নিত করছি? বাড়িতে কোন গুপ্তকুঠুরি থাকার কথাটা কি সত্যি? ওর কথামত যদি তা থেকেই থাকে তা হলে সেটার অবস্থান সম্পর্কে কিছু বলতে পারছে না কেন? কিন্তু লিজা এরকম নিশ্চিত যে বাড়িতে এ ধরনের কোন গুপ্তকুঠুরি নেই যদি এটা বুয়ার উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনা হয়ে থাকে তবে এর পেছনে কারণটা কি? লিজাকে লেখা অ্যাল-বার্টের প্রেম পত্রগুলো কি ওর চোখে পড়েছে। লিজার বাগদানের কথা শুনে ও যেন একটু অবাকই হলো কিন্তু কেন?

২.মালীঃ লোকটাকে যতটা বোকা বলে মনে হয়, আসলেই কি তাই? বুয়া এবং মালীর যৌথ প্রচেষ্টায় কোন ষড়যন্ত্র সফল হওয়া কি খুবই অসম্ভব? এখানে মনে রাখতে হবে, লিজার উইলের সাক্ষী ছিল এরাই।

৩. বুয়া এবং মালীর নাবালক সন্তানঃ একে সন্দেহ তালিকার বাইরে রাখা যেতে পারে।

৪. মি. ডি কষ্টাঃ এই ডি কষ্টা ভদ্রলোকটি সন্দেহজনক। ও কি লিজার কথামত অ্যালবার্টের ঠিকানায় ওর উইলটা পোস্ট করেছিল? আর যদি সে পোস্ট না করে থাকে তা হলে এর পেছনে যুক্তি কি?

৫. মিসেস ডি কস্টাঃ শারীরিকভাবে পঙ্গু। তবে উইল সংক্রান্ত কোন চক্রান্তের ব্যাপারে ওর অবদান থাকা বিচিত্র কিছু নয়।

৬. রিয়াঃ বরাবরই আমাদের সন্দেহের তালিকায় অবস্থান করছে সে। লিজার বাগদানের ব্যাপার কি সে আগে থেকে জানত? রবার্টের লেখা চিঠিগুলো কি সে কখনো দেখেছে? (যদি তাই হয় সে ক্ষেত্রে তার মত চালাক মেয়ে ঠিকই বুঝেছিল, লিজাই রবার্টের সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হতে যাচ্ছে) এ ছাড়া সে কি জানত লিজার উইল অনুসারে ওর সিংহভাগ সম্পত্তি সে-ই পেতে যাচ্ছে? ঐ চিরকুটটাই বা কিসের? তাতে যে একজন লোকের আভাস পাওয়া যাচ্ছে সে-ই কি আমাদের সম্ভাব্য অজ্ঞাত ব্যক্তি? আর চকোলেটের ব্যাপারটা তো আর তার দিক থেকে মোটেই পরিষ্কার নয়। মনে হয়, গুরুত্বপূর্ণ কোন তথ্য সে গোপন করে যাচ্ছে?

দেখ, ঘটনাকে যতই বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করি না কেন, বারবার ঘুরে ফিরে রিয়ার প্রসঙ্গ চলে আসছে। সে-ই কি পুরো ঘটনার সঙ্গে জড়িত, নাকি ঘটনার সঙ্গে জড়িত এমন কাউকে সে আড়াল করার চেষ্টা করছে? যেভাবেই হোক , তাকে দিয়ে কথা বলাতে হবে। যাক, বাদ বাকিটুকুও তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছি-

৭. ফিরোজঃ চকোলেটের ব্যাপারে ওকে সন্দেহ করার অবকাশ আছে। ও-ই কি কোকেন মেশান চকোলেট লিজার ওখানে পৌঁছে দিয়ে এসেছিল? যদিও অপ্রাসঙ্গিক, তবু এখানে একটা ব্যাপার খেয়াল করতে হবে, একজন পাকা ব্যবসায়ী হয়ে লিজার বাড়ির একটা অয়েল পেইন্টিং ও ন্যায্য দামের চেয়ে অনেক বেশি দিয়ে কেন কিনতে চেয়েছিল?

৮.ক্যাপ্টেন হোবার্টঃ লিজা বাগদানের কথা শুধুমাত্র ওর কাছে কেন বলেছিল? ও কি লিজাকে কোনরকম প্রস্তাব দিয়েছিল? এ ছাড়া ডাক্তার মামার সঙ্গে ওর সম্পর্ক কেমন? ওরা কি পরস্পরের খুবই ঘনিষ্ঠ?

৯.অ্যালবার্টঃ লিজার উইলের ব্যাপারে ওকে সন্দেহ না করে উপায় নেই আপাতদৃষ্টিতে লোকটাকে সৎ এবং বুদ্ধিমান বলেই মনে হয়। কিন্তু এই একটা ব্যাপারেই ওর সততা সম্বন্ধে মনে সন্দেহ জাগে-লোকটা কি আসলেই সৎ ও নীতি পরায়ণ, নাকি চতুর এক ভণ্ড?

১০.অজ্ঞাত ব্যক্তিঃ আগাগোড়াই আমার একটা ধারণা যে, পুরো ঘটনার মধ্যে একজন অজ্ঞাত ব্যক্তির ভূমিকা আছে। কিন্তু কথা হচ্ছে, এমন একজন ব্যক্তি সত্যি কি আছে, নাকি...!

'ঐ যে, দেখ, জানালা দিয়ে কে যেন উঁকি দিচ্ছে...!'

আমার কথা শেষ হবার আগেই লাফ দিয়ে জানালার ধারে পৌঁছে গেল আসাদ। ভাল করে চারদিক চেয়ে বলল, 'কোথায় কে উঁকি দিচ্ছে! ওসব কিছু না, তোমার জ্বরটা বেড়েছে বোধ হয়। কি দেখতে কি দেখেছ, কে জানে!'

'সত্যি বলছি। একটা কঙ্কালসার ফ্যাকাশে মুখ দেখলাম। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই চট্ করে সরে গেল।'

চিন্তিত দেখাচ্ছে আসাদকে। 'এখানে আসার পর ঐ মুখ আর কখন দেখছ?'

'না চেহারাটা যেন কোন মানুষের নয়! এক কথায় বীভৎস।'

আসাদ কাগজগুলো গুছিয়ে পেপার ওয়েট চাপা দিয়ে রাখতে রাখতে বলল, 'যাক, ভালই হয়েছে। আগন্তুক আমাদের কথা আড়ি পেতে যদি শুনেও থাকে লিজার মৃত্যুর ব্যাপারটা যে সাজানো তা জানতে পারেনি। ভাগ্যিস, আমরা এতক্ষণ এ নিয়ে কোন কথা বলিনি!'

'ভাল কথা, তোমার কতদূর অগ্রগতি হলো? বেশ কয়েক ঘণ্টা তো পেরিয়ে গেছে।'

'এত অধৈর্য হলে চলবে কেন, মাত্র তো কয়েক ঘণ্টা পেরিয়েছে। আমার সর্বোচ্চ সময়সীমা চব্বিশ ঘণ্টা। অবশ্য এর কিছুটা হেরফেরও হতে পারে। তবে আমার স্থির বিশ্বাস, কাল বেলা বারোটার মধ্যে ঘটনার অগ্রগতি হবেই।'

পরদিন ভোরেই ঘুম ভাঙল। জ্বর ছেড়েছে। শরীরের ম্যাজম্যাজে ভাবটাও দূর হয়েছে। আসাদের হাতে দৈনিক জনবার্তার কপি। লিজার মৃত্যু সংবাদটা বেশ ফলাও করে ছেপেছে।

নাশতা সেরে ব্যালকনিতে বসে বিশ্রাম করছি। এর মধ্যেই আসাদ বার দুই বাইরে থেকে চক্কর দিয়ে এসেছে। আমাকে বলেছিল সঙ্গে যেতে, কিন্তু শরীর এখনো দুর্বল। তাই হোটেলেই বিশ্রাম নিচ্ছি। বসে বসে এ ক'দিনের ঘটনাগুলো কথা ভাবছি।

এমন সময় বেয়ারা একগাদা চিঠি বাছাই করে যেগুলো আমার নামে এসেছে সেগুলো আমার হাতে দিল। একে একে খুলে পড়তে শুরু

করলাম। প্রথম চিঠিটা এসেছে ঢাকার নামকরা এক প্রেতচর্চা ক্লাব থেকে। ওদের মাসিক সাধারণ সভায় যোগ দেয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়ে লেখা। 'দেখো, যদি দু-একদিনে আততায়ীর ধরা না পড়ে শেষমেষ প্রেত সাধকদের সাহায্যই নিতে হবে কিন্তু! প্ল্যানচেটে এলির আত্মাকে ডেকে এনে জিজ্ঞেস করলে ঠিক ঠিকই খুনীর নাম জানা যাবে।'

'মনে হয় না,' মন্তব্য করল আসাদ, 'এলি খুন হবার সময় আততায়ী চেহারা দেখতে পেয়েছে কিনা সে ব্যাপারে আমার ঘোর সন্দেহ আছে।'

'খুনীকে না দেখলেও নামটা ঠিক ঠিকই বলতে পারবে। আত্মারা পরপারে গিয়ে সবকিছু জেনে যায়।'

সবশেষ চিঠিটা খুলে পড়তে পড়তে হঠাৎ চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল আসাদের। পড়া শেষ করে সেটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিল। চিঠিটা এরকমঃ

মি. রহমান চট্টগ্রাম।

আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা রইল। ঐ দিন কক্সবাজার থেকে এখানে ফেরার পর এলির লেখা একটা চিঠি পাই। লিজার ওখানে পৌঁছেই ও এই চিঠিটা আমাকে লিখেছিল। এতে আপনার তদন্তের সাহায্য হবে এমন কোন তথ্য নেই বলেই আমার বিশ্বাস। তবু চিঠিটা আপনি হয়তো দেখতে চাইতে পারেন, তাই এই সঙ্গে পাঠিয়ে দিলাম। কক্সবাজার থাকাকালীন আপনার সহানুভূতি ও সহৃদয়তার কথা আমার চিরদিন মনে থাকবে।

শুভেচ্ছান্তে,
এলির মা।

এলির চিঠিঃ

কক্সবাজার।

আম্মা,

কেমন আছো তুমি? আমি ঠিকমতই এখানে এসে পৌঁছেছি। পথে কোন অসুবিধা হয়নি। কক্সবাজারের আবহাওয়া এখন চমৎকার। লিজাকে দেখে মনে হলো, কোন কারণে কিছুটা যেন দুশ্চিন্তা আছে। ভেবে পাচ্ছি না, আমাকে টেলিফোন করার এমন কি দরকার পড়ল? বধুবারের ব্যাপারে সবকিছু তো আগে থেকেই ঠিকঠাক ছিল। মি. ও মিসেস ডি কস্টার সঙ্গে

আলাপ হলো। ওরা এককথায় চমৎকার! রিয়া আর ওর বন্ধু ফিরোজের সঙ্গেও দেখা হয়েছে। চিঠিটা এখনই বাড়ির কাছে, রাস্তার ওপারে যে ডাকবাক্স আছে তাতে ফেলছি–যাতে কালই তুমি পেয়ে যাও। আজ আর না।

তোমারই

এলি।

'দেখো, তোমার প্ল্যানচেটের আগেই মৃতের সঙ্গে যোগাযোগ হলো আমাদের। আর তার ফলাফল হচ্ছে–বিরাট একটা শূন্য। এলির চিঠিতে যে ডাকবাক্সের উল্লেখ আছে, মি. ডি কস্টা ঐ বাক্সেই লিজার উইলটা অ্যালবার্টের ঠিকানায় পোষ্ট করেছিলেন।'

'উইলটা সত্যি সত্যিই তিনি পোষ্ট করেছিলেন কিনা সে ব্যাপারে আমার কিন্তু যথেষ্ট সন্দেহ আছে।'

'আমারও। তবে এ ব্যাপারে সত্যি-মিথ্যা সময়েই প্রমাণিত হবে।'

'যাক, বাদবাকি চিঠিগুলোতে কি কিছু পেলে?'

'নাহ্, একদম ফাঁকা। এখন মনে হচ্ছে, পরিকল্পনায় কিছু ভুল ছিল আমাদের...।'

ক্রিং ক্রিং শব্দে টেলিফোন বেজে উঠল। উঠে গিয়ে রিসিভার তুলল আসাদ। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে চেহারায় পরিবর্তন দেখা গেল ওর। খুশিতে চোখমুখ উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। মিনিট দুয়েক আলাপের পর নামিয়ে রাখল রিসিভার। 'কি, বলিনি, কোন না কোন দিক দিয়ে ঘটনায় অগ্রগতি হবেই! কে টেলিফোন করেছিল, জানো?'

'কে?'

'অ্যালবার্ট। আজকের ডাকে লিজার উইলটা ওর কাছে এসেছে উইলে অবশ্য গত ২৫ ফেব্রুয়ারির তারিখ দেয়া।'

'যাক, তা হলে দেখা যাচ্ছে, পুরো ঘটনায় কিছুটা হলেও অগ্রগতি হয়েছে।'

'হ্যাঁ, এবং আশা আছে, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আরও অগ্রগতি হবে।'

'তোমার কি মনে হয়, উইলের ব্যাপারে অ্যালবার্ট সত্যি কথা বলছে?'

আমার প্রশ্নের সরাসরি উত্তর না দিয়ে ও বলল, 'তুমি কি বলতে চাচ্ছো, বুঝতে পেরেছি। আগাগোড়া উইলটা ওর কাছেই ছিল, লিজার মৃত্যু সংবাদ শোনার পর সেটা সবার কাছে প্রকাশ করতে চাইছে–এই তো! এরকমটা হওয়া বিচিত্র কিছু নয়।'

'উইল বাটোয়ারার ব্যাপারে কি বলল অ্যালবার্ট?'

'এ ব্যাপারে আমি কিছু জিজ্ঞেস করিনি, এ ছাড়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আগে তা বলা হয়তো আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে উচিতও হবে না। অ্যালবার্ট অবশ্য বলেছে, লিজার অপারেশনের সময় যে উইলটা করা হয়–এটা সেই উইল। সাক্ষী হিসেবে বুয়া ও তার স্বামীর স্বাক্ষর আছে এতে।'

'তা হলে দেখা যাচ্ছে, রবার্টের সম্পত্তি লিজার অধিকারে আসার পর এই উইল অনুসারে রিয়ারই সবচেয়ে লাভবান হবার কথা।'

'হ্যাঁ, এই নামটিই ঘুরেফিরে আসছে বারবার। ফারিয়া ইসলাম, ওরফে রিয়া। চালচলন, আচার-ব্যবহার সবই ওর ভাল। তবু সন্দেহ তালিকায় সবার উপরে স্থান দিতে হচ্ছে ওকে।'

পরিবেশটা হালকা করার জন্য বললাম, 'রিয়া এমনিতে ঠাণ্ডা স্বভাবের হলেও মাঝেমধ্যে ভীষণ রেগে যায়, যখন ফিরোজ ওকে মিস ফা বলে ডাকে।'

'রেগে যাবারই কথা। ফারিয়া থেকে সংক্ষেপ করে রিয়া পর্যন্ত চলতে পারে। কিন্তু শুধু ফা মোটেই শ্রুতিমধুর নয়। আর এই অদ্ভুত শব্দটি যদি প্রেমিক প্রবরের মুখ দিয়ে বেরোয় তা হলে তো রাগ হবারই কথা।'

'এদিক দিয়ে এলিজাবেথ নামটার কিন্তু অনেক সুবিধা। লিজ, লিজা, এলিজা, এলি এরকম আধ ডজন আদুরে নাম বানানো যায় এ থেকে। যাক, এখন বলো তো, তুমি কি আগে থেকেই নিশ্চিত ছিলে যে এরকম একটা ঘটনা ঘটালে উইলটা বেরিয়ে আসবে?'

'না,নির্দিষ্ট কোনকিছু মাথায় ছিল না আমার, তবে বিশ্বাস ছিল, এটা পুরো ঘটনায় যে কোন দিক থেকে পরিবর্তন আনবে। আচ্ছা, এলির চিঠিটা দাও তো, একটা ব্যাপারে কেমন যেন খটকা লাগছে।'

চিঠিটা ওর হাতে দিয়ে আমার চিঠিগুলোয় মনোনিবেশ করলাম। হঠাৎ চিৎকার করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল আসাদ। 'উহ্, আস্ত একটা গর্দভ আমি! এবারে সত্যি সত্যি গোয়েন্দাগিরি থেকে আমার ইস্তফা দেয়া উচিত।'

'কি ব্যাপার! এভাবে ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছো কেন? হয়েছেটা কি?'

'কি হয়নি, তাই বলো! নাহ্, বুদ্ধি আমার সত্যি সত্যিই ভোঁতা হয়ে গেছে। নইলে...।'

'আচ্ছা, কি হয়েছে খুলে বলবে তো, নতুন কোন জটিলতার সৃষ্টি হলো নাকি?'

'জটিল? বলছো কি তুমি! ঘটনা তো এখন সরল অংকের চেয়েও সহজ! কিন্তু না, আর একটা কথাও নয়। আমাকে সবকিছু আবার গোড়া

থেকে ভাবতে হবে।' সন্দেহজনক ব্যক্তিদের তালিকাটায় দ্রুত চোখ বুলাচ্ছে ও। উত্তেজনায় মাঝে মাঝে ঠোঁট কামড়ে ধরছে। আর কথা না বাড়িয়ে আড়চোখে ওকে করতে লাগলাম। একসময় ধপাস্ করে পাশের ইজি চেয়ারটায় বসে পড়ল ও। দু'চোখ বুজে নিঃশব্দে সিগারেট টানছে। চোখ বোজা অবস্থাতেই বিড়বিড় করে কি যেন বলছে আর থেকে থেকে সিগারেটে লম্বা টান দিচ্ছে।

আরও কিছুক্ষণ পর হঠাৎ উঠে দাঁড়াল ও। চেহারায় পরিতৃপ্তির ছাপ। 'হ্যাঁ, সবকিছু একেবারে খাপে খাপে মিলে গেছে। এ ক'দিন যে ঘটনাগুলো আমাকে ধাঁধায় রেখেছিল সেগুলোর উত্তর পাওয়া গেছে।'

'মানে? তুমি কি এই কিছুক্ষণের মধ্যে রহস্যের কিনারা করে ফেললে নাকি?'

'হ্যাঁ, পুরোপুরি না হলেও নব্বুই ভাগ তো বটেই। একটা কথা জানার জন্য চট্টগ্রামে টেলিফোন করতে হবে-অবশ্য আমার অনুমান যদি ভুল না হয়ে থাকে তা হলে ধরে নাও সেটাও ইতি মধ্যেই আমি জেনে গেছি তবু...'

'টেলিফোনের উত্তর পেয়ে নিশ্চিত হবার সাথে সাথেই কি রহস্যের যবনিকাপাত হবে?'

আমার কথা উত্তর না দিয়ে ভিন্ন প্রসঙ্গে চলে গেল আসাদ, 'তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে, বুয়া থেকে শুরু করে অনেকেরই ধারণা, লিজার বাড়িতে অশরীরী প্রেতাত্মার আনাগোনো আছে। আজ রাতেও ঐ বাড়িতে অশরীরী প্রেতাত্মার আগমন ঘটবে। লিজার প্রেতাত্মা!'

'না,' আমি কিছু একটা বলতে চাচ্ছিলাম, কিন্তু বাধা দিয়ে বলে উঠল ও, 'এখন আর কোনে কথা নয়। শুধু একটা কথা জেনে রাখো–আজ রাতেই সমস্ত রহেস্যর যবনিকাপাত হবে। এখনো অনেক আয়োজন বাকি তুমি বরং বিশ্রাম নাও,' ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল ও।

দশ

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না। জেগে দেখি, অনেকক্ষণ আগেই সন্ধ্যে হয়েছে। আসাদ এর মধ্যে রুমে এসেছিল নিশ্চয়ই। একটা চিরকুট লিখে রেখে গেছে। তাতে রাত আটটার সময় লিজার বাড়িতে উপস্থিত থাকতে বলেছে।

হাতমুখ ধুয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে তৈরি হয়ে নিলাম। লিজার বাড়িতে পৌঁছতে পৌঁছতে প্রায় আটটা বেজে গেল। ডাইনিং হলের গোল টেবিলটা ঘিরে সবার বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আসাদের সেই তালিকার প্রায় সবাই উপস্থিত আছে। বুয়ার নাবালক সন্তানকে সন্দেহ করার মত কিছু পাওয়া যায়নি। তাই সম্ভবত এখানে তাকে ডাকা হয়নি। মিসেস ডি কস্টা এসেছেন হুইল চেয়ারে করে। সবার চেহারায় কিছুটা উৎকণ্ঠা। কৌতূহলী চোখগুলো আসাদকে জরিপ করছে যেন।

সবাই যে যার মত আসন গ্রহণ করেছে। ভাল করে সবাইকে একনজর দেখে নিল আসাদ। তারপর অ্যালবার্টকে ইশারা করতেই উঠে দাঁড়াল সে। গলাটা একটু পরিষ্কার করে নিয়ে আরম্ভ করল, 'এখানে আজ কোন প্রথামাফিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আসিনি আমরা। লিজার আকস্মিক মৃত্যুই আমাদের সবাইকে এখানে জমায়েত করেছে। আর আমরা এ-ও জানি, মৃত্যুটা স্বাভাবিক নয়। কোকেন প্রয়োগের ফলে মৃত্যু হয়েছে ওর। সেটা অবশ্য পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট থেকে আরও ভালভাবে জানা যাবে। কিন্তু সে সব পুলিশী ব্যাপার। তাই আমি সেদিকে যাচ্ছি না।

'এবারে মূল বক্তব্যে আসা যাক। সাধারণত মৃতের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পরই উইলের বিষয়বস্তু সাধারণ্যে প্রকাশের নিয়ম। কিন্তু লিজার মৃত্যু স্বাভাবিক নয়। উপরন্তু প্রখ্যাত ডিটেকটিভ জনাব আসাদ রহমানের অনুরোধে একটু পরেই উইলটা পড়ে শোনানো হবে। এখানে আর একটা কথা উল্লেখ করতে চাই। যদিও উইলে তারিখ উল্লেখ আছে ২৫ শে

ফেব্রুয়ারি, কিন্তু এটা আজ সকালে ডাকে আমার কাছে এসে পৌঁছেছে। যাহোক, উইলে হাতের লেখাটা নিঃসন্দেহে আমার ফুফাতো বোন লিজার–এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। এ ছাড়া সাক্ষী হিসেবে বুয়া এবং মালীর স্বাক্ষর আছে।'

পাশের ছোট টেবিলের উপর রাখা ব্রিফকেস খুলে লম্বা একটা খাম বের করল অ্যালবার্ট। একটু কেশে গলাটা আরেকবার পরিষ্কার করে নিল সে। এতক্ষণে যারা নিজেদের মধ্যে ফিসফিসিয়ে কথাবার্তা বলছিল, এবার তারাও চুপ হয়ে গেছে। সবার দৃষ্টি এখন ওই লম্বা খামের দিকে নিবদ্ধ। খামটা খুলে ভেতর থেকে লম্বা একটা কাগজ বের করে মেলে ধরল সেটা। এবারে উইলটা পড়তে শুরু করল অ্যালটবার্টঃ

মিস এলিজাবেথ গোমেজের সর্বশেষ উইল

আমি, এলিজাবেথ গোমেজ, এই মর্মে নির্দেশ প্রদান করিতেছি যে, আমার মৃত্যুর পর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যয়ভার আমার সম্পত্তি হইতে বহনের জন্য আমি আমার মামাতো ভাই অ্যালবার্ট গোমেজ–যিনি আমার আইন বিষয়ক উপদেষ্টা, তাঁহাকে নির্দেশ প্রধান করিতেছি। প্রকাশ থাকে যে, উক্ত খরচাদি মিটাইবার পর অবশিষ্ট যাবতীয় সম্পত্তি আমার পিতার প্রতি অসীম আনুগত্য ও অশেষ উপকার সাধনের কারণে কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ মিসেস ডি কস্টার নামে এই উইলের মাধ্যমে প্রদান করিলাম।

স্বাক্ষর–

এলিজাবেথ গোমেজ

সাক্ষী

১. সাহেরা খাতুন (বুয়া)

২. আবদুল খালেক (মালী)

কারো মুখে কোন কথা নেই। উইলের বিষয়বস্তু পড়ে শোনানোর পর বিস্ময়ে সবাই যেন বোবা বনে গেছে। হতবিহ্বল ভাব কাটিয়ে প্রথমে কথা বলে উঠলেন মিসেস ডি কস্টাই। 'দেখো দেখি, কি কাণ্ড! এমন কী বা করেছি যার জন্য সম্পত্তি লিখে দিতে হবে? আসলে যেমন বাপ তার তেমনি মেয়ে। পুরনো শুভাকাঙ্ক্ষীকে যেন ভুলে যায়নি এই-ই তার প্রমাণ। লিজা প্রমাণ করে গেল, কৃতজ্ঞতাবোধ জিনিসটা পৃথিবী থেকে উবে যায়নি–' দার্শনিকের মত শোনাল মিসেস ডি কস্টার কণ্ঠস্বর।

এত কথার পরেও উপস্থিত সকলের ইতস্তত ভাবটা কাটল না। একটা চাপা অবিশ্বাসের গুঞ্জন ঘরময় প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। এই অস্বস্তিকর

পরিস্থিতিতে অ্যালবার্টের উদ্দেশে বলল আসাদ, 'মনে হয়, নিকট আত্মীয় হিসেবে উইলের বৈধতা নিয়ে আপনি চ্যালেঞ্জ করতে পারেন, তাই না?'

কড়া দৃষ্টিতে আসাদের দিকে চাইল অ্যালবার্ট। 'আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে উইলটা একদম ঠিক আছে। তা ছাড়া আমার ফুফাতো বোনের শেষ ইচ্ছার বৈধতা নিয়ে চ্যালেঞ্জ করব, এরকম ছোট লোক অন্তত আমি নই।'

'আপনার ন্যায়পরায়ণতা দেখে সত্যিই আমি মুগ্ধ। উইলে যা-ই থাক না কেন, আপনি যাতে বঞ্চিত না হন সে দিকটা অবশ্যই আমি দেখব,' বললেন মিসেস ডি কস্টা।

'পুরো ব্যাপারটাই আশ্চর্য ঠেকছে! লিজা কিন্তু এ ব্যাপারে সামান্য আভাসটুকুও কোনদিন দেয়নি,' মন্তব্য করলেন মি. ডি কস্টা।

'কে জানে ওপার থেকে আগ্রহভরা দৃষ্টি নিয়ে হয়তো দেখছে আমাদের,' ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে রুমাল বের করে চোখের কোণে জমে থাকা অশ্রু মুছলেন মিসেস ডি কস্টা। এক পর্যায়ে ফুঁপিয়ে উঠলেন তিনি, 'আজ যদি ওর আত্মা আমাদের মাঝে নেমে আসত তা হলে বলতাম, "লিজা, চাইনা তোমার সম্পত্তি। তুমি আবার আমাদের মাঝে ফিরে এসো"।' দু-হাত দিয়ে মুখ ঢাকলেন মিসেস ডি কস্টা।

হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল আসাদ। চেহারায় উত্তেজনা। 'আমরা সবাই চাই, লিজা আবার আমাদের মাঝে ফিরে আসুক। কিন্তু বাস্তবে তো তা হবার নয়,' আমার দিকে নির্দেশ করে বলল, 'এক কাজ করা যাক; হাবিব মিডিয়াম হিসেবে তুলনাহীন। যে কোন আত্মাকেই ইচ্ছে করলে ও ডেকে নামাতে পারে। আমরা যখন সবাই উপস্থিত আছি, তখন প্ল্যানচেটে লিজার আত্মাকে ডেকে আনার চেষ্টা করি না কেন!'

কারো সম্মতি কিংবা অসম্মতির তোয়াক্কা না করে রুমের বাতি নিবিয়ে দিল ও। তবু একেবারে ঘুটঘুটে অন্ধকার হলো না। ডাইনিং হল আর ড্রইংরুমের মাঝখানে ভারী পর্দা টানানো। তবু পর্দার ফাঁক দিয়ে আলোর অস্পষ্ট আভা নজরে আসছিল। আর জানালা খোলা থাকায় বাইরে থেকেও খানিকটা আলোর ছটা উঁকি দিচ্ছিল।

আসাদের নির্দেশ সবাই লিজার চেহারা মনে মনে কল্পনা করতে লাগল। একটু পর আমার কানের কাছে ফিসফিসিয়ে উঠল আসাদ, 'ধৈর্য ধরে আর একটু অপেক্ষা করো। কিছুক্ষণ পরেই শুরু হবে নাটক।'

সময় যেন আর কাটতে চায় না। অন্ধকারে এভাবে বসে থাকতে থাকতে মনের মাঝে কেমন যেন একটা অতিপ্রাকৃত ভাবের সৃষ্টি হয়। স্নায়ুগুলো অতিলৌকিক কল্পনার কাছে তখন পুরোপুরি সমর্পিত হয়ে পড়ে

যদিও আজকের আসরে যারা উপস্থিত তাদের কেউই জানে না, যা আমি আর আসাদ জানি। কিন্তু তবু...। ভাবনার স্রোতে বাধা পড়ল। একটা হিমেল হাওয়ার ঝাপটা রুমের সবাইকে যেন এক অশরীর পরশ বুলিয়ে দিয়ে গেল। দুলে উঠল ড্রইং রুম এবং ডাইনিং হলের মাঝখানের ভারী পর্দা। বাতাসের ঝাপটায় পর্দার মাখখান থেকে দুই অংশে বিভক্ত হয়ে বেশ খানিকটা জায়গা ফাঁক হলো যেন। ড্রইংরুমের আলো পর্দার সেই ফাঁক দিয়ে ডাইনিং হলেও ঢুকে পড়ল। আর তাই আমাদের সবার দৃষ্টি অজান্তেই চলে যাচ্ছিল ড্রইংরুমের দিকে। আর ঠিক তখনই আরম্ভ হলো নাটক!

কোন্ মন্ত্রবলে যেন খুলে যেতে লাগল ড্রংইরুমে ঢোকার দরজা। সবার দৃষ্টি এখন সেই দিকে। একটু একটু করে খুলে যাচ্ছে দরজাটা। দরজার বাইরে আলো ও অন্ধকারের মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে এক মানবীর প্রতিমূর্তি। বাইরের অন্ধকারে চেহারাটা ঠিক নজরে আসছে না। সমস্ত শরীর সাদা কাপড়ে মোড়া। ধীরে ধীরে মূর্তিটা ড্রইংরুমে ঢুকল–লিজা! ধীর পায়ে ডাইনিং হলের দিকেই এগিয়ে আসছে। অসাধারণ ছন্দোময় ওর প্রতিটি পদক্ষেপ। এক অশরীরী প্রেতাত্মা, বাতাসে ভর দিয়ে উড়ে আসছে যেন।

পর্দার ফাঁকটাকে হাত দিয়ে টেনে বড় করে এবার ডাইনিং হলে ঢুকল লিজা। 'হায় ঈশ্বর, হায় ঈশ্বর,' বলে চিৎকার করে উঠলেন মিসেস ডি কস্টা। মি.ডি কস্টাও বোধহয় কিছু একটা বলতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু গলা দিয়ে গর্‌র্ শব্দ ছাড়া আর কিছু বেরুলো না। ঘটনার আকস্মিকতায় উত্তেজনা চেপে রাখতে না পেরে চেয়ার থেকে হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে নিজেকে কোনমতে সামলে নিল হোবার্ট। অন্ধকারেও লক্ষ্য করলাম, ভীতচকিত হয়ে ফিরোজের একটা হাত চেপে ধরেছে রিয়া। বুয়া ও তার স্বামী বিড়বিড় করে দোয়া-দরূদ পড়ছে বলে মনে হলো। 'ঐ তো, ঐ তো, লিজা!'–অন্ধকারে কে যেন বলে উঠল। 'আমাদের ভালবাসার, টানে আমাদের মাঝেই আবার ফিরে এসেছে ও'–পাশে থেকে কাঁপাকাঁপা গলায় উচ্চারিত হলো কথাগুলো। কণ্ঠটা মিসেস ডি কস্টার।

হঠাৎ জ্বলে উঠল ডাইনিং হলের বাতিগুলো। সুইচ বোর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে আসাদ। চেহারায় পরিতৃপ্তির হাসি। মনে হচ্ছে, পুরো নাটকের সফল মঞ্চাভিনয় হওয়ায় বেজায় খুশি হয়েছে ও। কিন্তু তখন কি জানতাম, এটা নাটকের শুরু মাত্র?

বাতি জ্বলে ওঠার পর রিয়াই প্রথমে কথা বলে উঠল, 'লিজা, তুমি কি সত্যি সত্যিই...।'

'হ্যাঁ, আমিই তোমাদের আদি ও অকৃত্রিম লিজা। আর, হ্যাঁ,' মিসেস

ডি কস্টার দিকে কঠোর দৃষ্টিতে চাইল ও, 'বাবার জন্য আপনি যা করেছেন সেজন্য আমি ও আমার চোদ্দ পুরুষ আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে জানাতে বাধ্য হচ্ছি, উইলের সম্পত্তি ভোগ করার জন্য আরও কিছুদিন আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে,' চিবিয়ে চিবিয়ে কথাগুলো বলল লিজা।

'হায়, ঈশ্বর, কি দেখছি এসব?' বিলাপের মত শোনাল মিসেস ডি কস্টার কণ্ঠস্বর। 'লিজা, তুমি তো, মা আমাদের মেয়ের মত। ব্যাপারটা কিন্তু মোটেই সিরিয়াস কিছু নয়–নিছুক একটা কৌতুক মাত্র।'

'হ্যাঁ, কৌতুকই বটে!' শ্লেষ মেশানো কণ্ঠে বলল লিজা।

আবার খুলে গেল ড্রইংরুমের দরজা। দরবলসহ ভেতরে ঢুকল জাফর। ডাইনিং হলের দিকে এগিয়ে এল ওরা। 'কি সৌভাগ্য আমার! কৌতুক মেশানো কণ্ঠে বলে উঠল জাফর, 'বহুদিন পর পুরনো এক শুভাকাঙ্ক্ষীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।' মিসেস ডি কস্টার দিকে তর্জনী উঁচিয়ে সবার উদ্দেশে বলল, 'পরিচয় করিয়ে দিই–মিলি রোজারিও, দেশের শ্রেষ্ঠ মহিলা জালিয়াত।' জাফরের ইঙ্গিত পেয়ে দুজন কনস্টেবল হইল চেয়ারে বসা অবস্থাতেই হাতকড়া পরিয়ে দিল ওকে। সবার উৎসুক দৃষ্টিতে দিকে ফিরে জাফর বলল, 'অপরাধ জগতে মিলি রোজারিওর মত চতুর জালিয়াত আর আছে কিনা সন্দেহ! অ্যাক্সিডেন্টে পঙ্গু হবার পরেও তার ফন্দিবাজ মাথা কিন্তু সবসময়েই সক্রিয় ছিল। আর তার প্রমাণ হচ্ছে এই উইল।'

'উইলটা কি তা হলে জাল?' জিজ্ঞেস করল অ্যালবার্ট।

'অবশ্যই জাল,' উত্তর দিল লিজা। 'যদিও হাতের লেখাটা আমার মতই, কিন্তু যে উইলটা আমি লিখেছিলাম তাতে এই বাড়িটা তোমাকে আর বাদবাকি সম্পত্তি রিয়ার নামে লিখে দিয়েছিলাম। সম্ভবত সাক্ষীর সই দুটোও জাল।' অ্যালবার্টের হাত থেকে উইলটা নিয়ে তাতে চোখ বুলিয়ে কয়েকবার মাথা নাড়ল লিজা।

'শুধু আপনার উইলই নয়। আজ ওদের বাসায় গোপনে তল্লাশী চালিয়ে আরও কিছু জাল উইল, দলিল, হুণ্ডি ইত্যাদি উদ্ধার করা হয়েছে। আসাদ, একদিন কথায় কথায় তুমি বলেছিলে, ওদের বাসায় ঢোকার সময় নাকি শিসের শব্দ শোনা যায়। এটা আর কিছু নয়, সঙ্কেতের আদান-প্রদান। কারণ হুট্ করে কেউ ঘরে ঢুকে গেলে জালিয়াতির নানারকম আলামত দেখে ফেলতে পারে, তাই এই সতর্কতা,' বলল জাফর।

আমাদের পরবর্তী কার্যক্রম কি হবে, তা নিয়ে ভাবছি। এমন সময় ঘটল অঘটন। খোলা জানালা দিয়ে পিস্তলের নল দেখা গেল। আমরা কিছু

বুঝে ওঠার আগেই গর্জে উঠল সেটা। একই সঙ্গে বাইরে ভারী কিছু পতনের শব্দ শোনা গেল। এদিকে রিয়ার বাহুতে লেগে বুলেটটা দেয়ালে গিয়ে আঘাত করল। ঘটনার আকস্মিকতায় সবাই হতবিহ্বল, কারো মুখে কোন কথা নেই। আসাদ দৌড়ে গেল জানালার দিকে। ঝুঁকে পড়ে কিছু একটা দেখার চেষ্টা করছে। পরমুহূর্তেই ড্রইংরুমের দরজা-খুলে বাগানের দিকে দৌড়ে গেল। পেছনে পেছনে ওকে অনুসরণ করল হোবার্ট।

মিনিট দুয়েক পর চ্যাংদোলা করে একটা লোককে নিয়ে এল ওরা। লোকটার চেহারার দিকে চেয়ে চমকে উঠলাম–সেই লোকটা! হোটেলের জানালায় উঁকি দিয়েছিল যে, কথা শুনছিল আড়িপেতে। সাদা ফ্যাকাশে একটা মুখ। চেহারায় বন্য জন্তুর হিংস্রতা। দেখেই বোঝা যাচ্ছে, শরীর অত্যন্ত দুর্বল। পড়ে গিয়ে মারাত্মকভাবে জখম হয়েছে। শ্বাসকষ্ট হচ্ছে লোকটার। অতিকষ্টে চোখ মেলে চাইল সে। ধীর পায়ে তার দিকে এগিয়ে এল রিয়া।

'আপনার কি খুব বেশি লেগেছে?'

'না। ডান বাহুর মাংস সামান্য ছড়ে গেছে,' আসাদের কথার জবাব দিল রিয়া।

লোকটার কাছে বসে তার মাথায় হাত রাখল রিয়া। কিছুক্ষণ পর মুখে কথা ফুটল লোকটার, 'বিশ্বাস করো, রিয়া, আমি সত্যি সত্যিই তোমায় খুন করতে চাইনি। আমার জন্য তুমি শুধু শুধু কষ্টই পেয়ে গেলে,' বোঝা যাচ্ছে, শেষ সময় উপস্থিত হয়েছে লোকটার। নিঃশ্বাস নিতে এখন রীতিমত কষ্ট হচ্ছে তার। 'আমি তোমার কোন ক্ষতি...চাই...না...সুখে...থে...কো... ভা...লো...থে...' কথাটা পুরাপুরি শেষ করতে পারল না। একটা খিঁচুনি তুলে নিথর হয়ে গেল দেহটা।

দু–হাতে মুখ ঢাকল রিয়া। সবার দৃষ্টি এখন ওর দিকে নিবদ্ধ। 'হ্যাঁ, এই লোকটাই আমার প্রাক্তন স্বামী।'

'আমাদের সন্দেহ তালিকার সেই "অজ্ঞাত ব্যক্তি"',' মন্তব্য করলাম।

'হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছো, তুমি,' সায় দিল আসাদ, 'শুরু থেকেই আমার মনে হয়েছে, ঘটনায় অদৃশ্য কারো হাত আছে। আজ তার প্রমাণ পাওয়া গেল।'

আবার কথা বলে উঠল রিয়া, 'গত কয়েক বছর ধরে কোকেনের নেশা করছে ও। আমাকেও এই পথে আনতে চেষ্টা করেছিল। ওর ফাঁদে পা দিয়ে প্রায় শেষ হয়ে যাচ্ছিলাম। অনেক কষ্টে এই সর্বনাশা নেশার খপ্পর থেকে নিজেকে মুক্ত করেছি। ওদিকে ওর নেশার মাত্রা এমন চরমে গিয়ে ঠেকল

যে সংসার করাই একরকম অসম্ভব হয়ে পড়ল। ফিরে এলাম নিজের বাড়িতে। আর তখন থেকে শুরু হলো যন্ত্রণার আরেক অধ্যায়।

'আমাকে সামাজিকভাবে অপদস্থ করার ভয় দেখিয়ে ব্ল্যাকমেইলিং করতে শুরু করল। প্রায়ই এসে মোটা অঙ্কের টাকা দাবি করত। বাধ্য হয়ে দিতে হত আমাকে। দিনকে দিন বেড়েই চলল ওর চাহিদা। আমার পক্ষে ওর খাঁই মেটানো প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ল। এক পর্যায়ে শাসাতে লাগল, যদি টাকা না দিই তা হলে খুন করবে আমাকে। আসলে নেশার পাপচক্রে এমনই জড়িয়ে গিয়েছিল যে কোন হিতাহিত জ্ঞান ছিল না। সর্বনাশা নেশাই শেষ পর্যন্ত কাল হয়ে দাঁড়াল ওর জীবনে।

আমার প্রথম থেকেই মনে হচ্ছেল, হয়তো আসাদ সাহেব আরও ভাল বলতে পারবেন, এলিকে সম্ভবত ও-ই খুন করেছে। কারণ যেদিন এলি খুন হয় তার আগের দিন ওকে টাকা দেয়ার সময় সীমা পার হয়ে গিয়েছিল। ও আমাকে শাসিয়েছিল, যদি টাকা না দিই তা হলে গুলি করে মারবে আমাকে। ঐদিন সম্ভবত এলিকেই অন্ধকারে আমি ভেবে ভুল করেছিল। কথাটা অবশ্য আগেই বলা উচিত ছিল আমার। কিন্তু তখন পুরোপুরি নিশ্চিত ছিলাম না। এ ছাড়া লিজার উপর বেশ কয়েকবার হামলা হওয়ায় মনে সন্দেহ জন্মেছিল এতে অন্য কেউ জড়িত থাকলেও থাকতে পারে।

'তারপর হঠাৎ একদিন আসাদ সাহেবের রুমে ঢুকে দেখলাম, টেবিলে ছোটো একটা দোমড়ান চিরকুট। সেটা আর কিছুই নয়, আমার কাছে লেখা একটা হুমকিপত্রের অংশবিশেষ। বুঝলাম, আসাদ সাহেব ঠিক পথেই এগোচ্ছেন। জানতাম, একসময় ও ধরা পড়বেই–এটা শুধু সময়ের ব্যাপার। কিন্তু একটা ব্যাপার এখনো মাথায় ঢুকছে না আমার। আমাকে ভয় দেখিয়ে টাকা আদায়ের সঙ্গে লিজাকে কোকেন পয়জনিং করার কি সম্পর্ক থাকতে পারে? আমাকে বিপদে ফেলার এটাও ওর আরেকটা কৌশল ছিল কিনা কে জানে!' আবারও দু-হাতে মুখ ঢাকল রিয়া।

এগারো

ফিরোজ এগিয়ে এসে রিয়ার কাঁধে হাত রাখল। 'কি, খুব বেশি খারাপ লাগছে?'

'না, না, ঠিকই আছি আমি–মাথাটা সামান্য ধরেছে।'

ওকে ধরে পাশের ইজি চেয়ারটায় বসিয়ে দিল ফিরোজ। গ্লাসে করে পানি এগিয়ে দিল। ঢক্‌ঢক্ করে গ্লাসের পুরো পানিটুকু নিঃশেষ করল রিয়া। এখন একটু যেন ভাল মনে হচ্ছে ওকে।

'এখন আমাদের কি আর কিছু করণীয় আছে?' জাফরের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করল রিয়া।

'আজ এখানে যা–কিছুর আয়োজন, সবই আসাদের নির্দেশে। এ ব্যাপারে থানা কর্তৃপক্ষ ওকে পুরো ক্ষমতা দিয়েছে। আজ আমি এখানে একজন অতিথি বৈ কিছু না। আমাদের আর কিছু করণীয় আছে কি নেই, সে কথা ও–ই ভাল বলতে পারবে।

রিয়া এবার ফিরল আসাদের দিকে। 'আপনিই কি তা হলে আজ স্থানীয় থানার প্রতিনিধিত্ব করছেন?'

'কী যে বলেন! আমি কর্তৃপক্ষের একজন নগণ্য উপদেষ্টা মাত্র। তাদের নির্দেশেই আজ রাতে আমাদের সবাইকে এখানে জড়ো হতে হয়েছে। এখানে আমি নেহায়েত একজন সমন্বয়কারী ছাড়া আর কিছু না।'

'আচ্ছা, এবার তা হলে পুরো ব্যাপারটার ইতি টেনে ফেলা যায় না?' জিজ্ঞেস করল লিজা।

'আপনি কি তাই চান?' পাল্টা জিজ্ঞেস করল আসাদ।

'হ্যাঁ, করণীয় আর কিছু আছে বলে তো মনে হয় না। পুরো ঘটনাই ঘটেছে আমাকে নিয়ে। নিশ্চয়ই আমার উপর নতুন করে আর হামলা হবে না–হামলাকারী আইনকে ফাঁকি দিয়ে এখন পরপারে।'

'হুঁ,' গম্ভীর কণ্ঠ আসাদের। কপালে চিন্তার ভাঁজ।

ওর চিন্তাক্লিষ্ট চেহারার দিকে চেয়ে আবার বলল লিজা, 'আপনি হয়তো এলির কথা ভাবছেন। কিন্তু কোন কিছুই আর তাকে আমাদের মাঝে ফিরিয়ে আনতে পারবে না। এছাড়া এসব নিয়ে বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করলে অনর্থক রিয়াকেই বিব্রতকর অবস্থায় ফেলা হবে।'

'আপনার কি তাই-ই মনে হয়?'

'নয় তো কি? আপনাকে আমি আগেই বলেছিলাম ওর স্বামী মানুষ নয়, একটা পশু। আর নিজের চোখেই তো দেখলেন। যাক, মরে গিয়ে ও নিজে বেঁচেছে, সেই সাথে সবাইকে বাঁচিয়ে দিয়ে গেছে। আর সেই সঙ্গে যবনিকাপাত হয়েছে পুরো ব্যাপারটার। এখন পুলিশ কর্তৃপক্ষ যদি মনে করে, তদন্ত সম্পূর্ণ হয়নি, তা হলে তাদের কাজ তাদেরকেই করতে দিন। ওরা হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াক এলির হত্যাকারীকে। কিন্তু যেটা বলছিলাম, ব্যাপারটা নিয়ে আর ঘাঁটাঘাঁটি করলে রিয়াকেই ঝামেলায় পড়তে হবে বেশি।'

'তো আপনি বলছেন, ঘটনার এখানেই ইতি টানতে?' চোখের তারায় কৌতুক খেলা করছে আসাদের।

'হ্যাঁ, এ ছাড়া আর কী বা করার আছে! বলল রিয়া।

কঠিন দৃষ্টিতে সবার চেহারার দিকে একবার করে চোখ বুলিয়ে নিল আসাদ। 'আপনারা সবাই কি বলেন? সবকিছুর এখানেই পরিসমাপ্তি ঘটানো উচিত, নাকি প্রথামাফিক তদন্ত চলতে থাকবে?'

প্রথমে আমার দিকে চাইল ও। 'ঝামেলার এখানেই ইতি হয়ে যাওয়া ভাল,' বললাম।

ফিরোজের দিকে চাইতে সে-ও আমার কথায় সায় দিল। একে একে সবার মতামত নেয়া হলো। প্রায় সবাই ঘটনার ইতি টানার পক্ষে মত দিল।

জাফর বলল, 'যেহেতু আমি আজ এখানে অতিথি-তাই কোন পক্ষ নেয়া আমার সাজে না। আর তাই এ ব্যাপারে আমি বরং নিরপেক্ষই রইলাম।'

'এরকম একটা ব্যাপার বিনা তদন্তে ইতি টানা আইনের দৃষ্টি-কোণ থেকে কিছুতেই উচিত হবে না,' জোরাল কণ্ঠে নিজের মতামত ব্যক্ত করল অ্যালবার্ট।

'শেষ পর্যন্ত তুমিও একথা বললে, অ্যালবার্ট? রিয়ার এবং আমাদের মান-সম্মানের কথা একবারও ভাবলে না?' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল লিজা।

'আমি খুবই দুঃখিত, লিজা। আইন নিয়েই কারবার আমার-আর তাই সবকিছুই আমাকে আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে হয়।'

'আপনার চারিত্রিক দৃঢ়তার পরিচয় পেয়ে সত্যিই আমি মুগ্ধ হয়েছি, অ্যালবার্ট। তা হলে দাঁড়াচ্ছে, একজন বনাম বাকিরা সবাই। বন্ধু জাফর নিয়েছে দর্শকের ভূমিকা। আমিও সেই একজনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সত্য উদ্‌ঘাটনের পক্ষে ভোট দিচ্ছি।'

'আসাদ সাহেব!' মিনতি ঝরে পড়ল লিজার কণ্ঠে।

'লিজা, আমি কিন্তু নিজে থেকে এই ঘটনায় জড়াইনি। পরিস্থিতি আমাকে বাধ্য করেছে সক্রিয় ভূমিকা নিতে। আর তাই সত্য উদ্‌ঘাটিত না হওয়া পর্যন্ত কাজ শেষ হবে না আমার।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে আমাদের সবার দিকে তর্জনী উঁচিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বলল ও, 'আপনারা সবাই যে যার আসনে চুপ করে বসুন। পুরো ঘটনা আসলে কি সেই সত্যটাই এখন আপনাদের কাছে বলব আমি,' পকেট থেকে সন্দেহজনক ব্যক্তিদের তালিকাটা বের করে টেবিলে রাখল, 'এখানে এক থেকে দশ পর্যন্ত সন্দেহজনক ব্যক্তিদের একটি তালিকা তৈরি করেছি। এতে নয় জনের নাম অর্ন্তভুক্ত করার পর মনে হলো ঘটনায় এমন কেউ থাকতে পারে, যে পর্দার আড়ালে থেকে কলকাঠি নাড়ছে। তাই ক্রমিক নম্বর দশ–এ একজন ''অজ্ঞাত ব্যক্তি'কে অর্ন্তভুক্ত করলাম। আর আমার অনুমান যে সত্যি, আজ রাতে তা টের পাওয়া গেল।

'কিন্তু আজ দুপুরের দিকে পুরো ঘটনাটা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে হঠাৎ আবিষ্কার করলাম–মারাত্মক একটা ভুল হয়ে গেছে। ঐ তালিকায় আমি একজনকে বাদ দিয়ে গেছি। তারপর নতুন ক্রমিক নম্বর এগারো যোগ করলাম।'

'তা হলে কি পুরো ঘটনায় আরও একজন অজ্ঞাত ব্যক্তির হাত আছে?' জিজ্ঞেস করল অ্যালবার্ট।

'না ঠিক তা নয়। সেক্ষেত্রে প্রথম জনকে দশ (ক) এবং দ্বিতীয় জনকে দশ (খ) হিসেবে চিহ্নিত করা যেত। এখানে ক্রমিক নম্বর এগারোর আলাদা বৈশিষ্ট আছে। তার নাম এই তালিকায় আগেই অর্ন্তভুক্ত করা উচিত ছিল, অথচ সে আমাদের সবার দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে।' রিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়ে বলল আসাদ, 'আপনি জেনে খুশি হবেন আপনার স্বামী কিন্তু এলিকে খুন করেনি। ওকে খুন করেছে আমাদের তালিকার সেই এগারো নম্বর ব্যক্তি।'

সন্দেহভরা দৃষ্টিতে আসাদের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করল রিয়া, 'কিন্তু এই এগারো নম্বর ব্যক্তিটি কে?'

আসাদ এবার জাফরের দিকে ইঙ্গিত করতেই উঠে দাঁড়াল সে। 'আসাদের কাছ থেকে গোপনে খবর পেয়ে সন্ধ্যাবেলায় আপনারা এখানে

পৌঁছানোর আগেই সবার দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে বিশেষ একটা জায়গায় লুকিয়ে থেকে সবকিছু পর্যবেক্ষণ করছিলাম।

'আপনারা এখানে জমায়েত হবার পর অ্যালবার্ট যখন লিজার উইল পড়তে শুরু করেছে, সে সময় লক্ষ্য করলাম আস্তে আস্তে খুলে যাচ্ছে ড্রইংরুমের দরজা। এক যুবতী খুব ধীর পায়ে ড্রইংরুমে প্রবেশ করল। রুমে বিছানো কার্পেটের একটা অংশ সরিয়ে ফেলল। তারপর দেয়ালে টাঙানো একটা অয়েল পেইটিং সরাল। সেখানে দেখা গেল একটা সুইচ। তাতে চাপ দিতেই কার্পেট সরানো অংশের মোজাইক সরে গিয়ে বেশ বড় একটা গর্তের সৃষ্টি হলো। সেই গর্তে হাত ঢুকিয়ে একটা পিস্তল বের করে আনল মেয়েটা। তারপর সবকিছু আবার ঠিকঠাক করে ড্রইংরুমের পাশেই যে ড্রেসিং রুমটা, সেখানে প্রবেশ করল সে। আজ যারা এখানে এসেছে তাদের অনেকেরই গরম কাপড়, ভ্যানিটি ব্যাগ, ছড়ি ও অন্যান্য জিনিস রাখা দেখলাম রুমটায়। মেয়েটা এবারে রুমাল দিয়ে পিস্তলটা ভালভাবেই মুছে সেটা চালান করে দিল একটা লেডিস কোটের পকেটে। কোটটা আর কারো নয়–রিয়ার!'

একটা আর্তচিৎকার বেরিয়ে এল লিজার কণ্ঠ থেকে, 'মিথ্যে, সব মিথ্যে! এসবের একবর্ণও বিশ্বাস করি না আমি।'

সবার দিকে চেয়ে বলল আসাদ, 'আসুন, এবার এলির খুনীর সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিই। খুনী সেই তালিকার এগারো নম্বর ব্যক্তি। সে আর কেউ নয়, আমাদের সবার অতি পরিচিত মিস এলিজাবেথ গোমেজ ওরফে লিজা।'

কারো মুখে কোন কথা নেই। রুমে বজ্রপাত হলেও বোধহয় এতটা অবাক হত না কেউ।

ততক্ষণে নিজেকে কিছুটা সামলে নিয়েছে লিজা। চিৎকার করে বলে উঠল সে, 'আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে! এলিকে আমি খুন করতে যাব কেন?'

'সেটা আমার চেয়ে আপনিই ভাল জানেন। রবার্টের বিপুল সম্পত্তির লোভেই ওকে খুন করেছেন আপনি। ওর আসল নামও এলিজাবেথ গোমেজ। আপনি নন, এলিই ছিল রবার্টের বাদদত্তা।'

'আপনি...আপনি...' কিছু একটা বোধহয় বলতে চাচ্ছিল লিজা, কিন্তু গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুল না।

আসাদ জাফরের দিকে ইশারা করতেই হুইসল বাজাল সে। বাইরে

থেকে আর কয়েকজন কনস্টেবল এসে রুমে ঢুকল। লিজাকে ওদের সঙ্গে যেতে নির্দেশ দিল সে।

'আপনারা সবাই নিশ্চয়ই পাগল হয়ে গেছেন,' অপ্রকৃতিস্থের মত শোনাল লিজার কণ্ঠ। 'কই, রিয়া, দাও দেখি তোমার ঘড়িটা। যেখানেই থাকি না কেন, সময় দেখতে এটা খুব কাজে লাগবে আমার।'

কয়েক মুহূর্ত বোকার মত ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থেকে হাতের ঘড়িটা খুলে ওর হাতে দিল রিয়া। 'কিছু ভেবো না,' বলল লিজা 'এসব অবাস্তব ও আষাঢ়ে গল্প আদালতে টিকবে না। খুব শিগগিরই আমি আবার ফিরে আসব সবার মাঝে। কিন্তু, আসাদ সাহেব, আপনাকে তো সবাই নামজাদা গোয়েন্দা হিসেবেই জানে। আপনি এই কৌতুক নাটকের অবতারণা করতে গেলেন কেন?' আগের মেজাজ যেন ফিরে এসেছে লিজার কণ্ঠে।

'হ্যাঁ, কৌতুক নাটকই বটে!' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল আসাদ, 'আর এই কৌতুক নাটকের প্রধান চরিত্রে আমাকে অভিনয় করতে দেয়া কিছুতেই উচিত হয়নি আপনার। এই ভুলটাই মারাত্মক বিপদ ডেকে এনেছে আপনার জন্যে।'

বারো

জাফর এবং তার দলবল, লিজা, মিঃ ও মিসেস ডি কষ্টাসহ চলে যাবার পর বাদবাকি লোকজনের ভিড় কমে গেলে রিয়া, ফিরোজ হোবার্ট অ্যালবার্ট, আসাদ ও আমি ডাইনিং হল থেকে ড্রইংরুমে এসে বসলাম। সবার জিজ্ঞাসা দৃষ্টি তখন আসাদের দিকে।

'ওহ্ আমাকে কি বোকাটাই না বানিয়েছে মেয়েটা! এ ক'দিন ধরে কলের পুতুলের মত যেভাবে খুশি সেভাবে নাচিয়েছে। রিয়া, আপনাকে বলতে শুনলাম লিজা নাকি অহরহ মিথ্যা কথা বলে। কথাটা যে কত সত্যি তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি–তবে অনেক পরে।'

'হ্যাঁ, লিজা যখন তখন মিথ্যা কথা বলত,' সায় দিল রিয়া 'আর তাই ওর উপর হামলার ঘটনাগুলো আমার কেন যেন বিশ্বাস হতে চাইত না।'

'কিন্তু এর ঠিক উল্টোটা ঘটেছিল আমার ক্ষেত্রে। আর সে জন্যেই ও যা বলত ঠিক তাই-ই বিশ্বাস করতাম আমি–এমনকি ওর উপর হামলার কাল্পনিক কাহিনিগুলোও।'

'তার মানে? ওগুলো কি তা হলে সত্যি সত্যিই ঘটেনি?' জিজ্ঞেস করলাম।

'না। খুব বুদ্ধি খাটিয়ে ওগুলো সাজানো হয়েছিল যাতে সত্যি সত্যিই মনে হয়, লিজার জীবন বিপন্ন। থাক সে কথা,' আমার দিকে ফিরল আসাদ, 'পুরো ঘটনাটা যেভাবে ধাপে ধাপে পরিণতির দিকে এগিয়েছে, এখন আমি সেটাই তোমাদের বলব। এগুলো কিন্তু একবারে চট্ করে মাথায় আসেনি। একটার সঙ্গে আরেকটা সূত্র জোড়া দিয়ে তবেই দাঁড় করাতে হয়েছে এর কাঠামো।

'লিজার সঙ্গে যখন প্রথম পরিচয় হলো তখন আমরা কি দেখলাম? অভিভাবকহীন বখে যাওয়া এক যুবতী, যার সাধ আছে সাধ্য নেই। দেনার দায়ে পৈত্রিক সূত্রে পাওয়া বাড়িটাও বন্ধক দেয়া।

'বছর দুয়েক আগে লিজার সঙ্গে রবার্টের পরিচয় হয়। ও জানত, রবার্টের দাদা দেশের হাতে গোনা কয়েকজন শিল্পপতিদের একজন। ও নিশ্চয়ই বুঝেছিল, তাঁর বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী এই রবার্ট। কাজেই ওকে প্রেমের ফাঁদে ফেলতে পারলে বিরাট লাভ। অন্যদিকে, লিজার সঙ্গে রবার্টের মেলামেশাটা ছিল বন্ধুর মত। ঠিক প্রেম বলতে যা বোঝার তা ওদের মাঝে ছিল না।

'বছরখানেক আগের কথা। রবার্টের সঙ্গে চট্টগ্রাম বেড়াতে গেল লিজা। এসময় রবার্টের সঙ্গে পরিচয় হলো এলির। পরিচয় থেকে ঘনিষ্ঠতা আর ঘনিষ্ঠতা থেকে প্রেমের জন্ম হলো। মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল লিজার। রবার্ট যে এলির মত সাধারণ একটা মেয়ের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তুলবে, এটা ধারণাতেও ছিল না তার। যে মেয়ে সুন্দরীর তালিকায় বিশেষ স্থান পায় না, রবার্টের চোখে তাকেই মনে হলো অসামান্য। আরও দুর্যোগ অপেক্ষা করছিল লিজার জন্য। গোপনে বাগদান–পর্ব সম্পন্ন করল ওরা। একথা এলি আর কাউকে না বললেও লিজাকে নিশ্চয়ই বলেছিল। এবং পরবর্তী সময়ে রবার্টের লেখা প্রেমপত্রগুলোও সরল মনে ওকে দেখিয়েছিল। এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে। আত্মীয়তার দিক দিয়ে ওরা চাচাতো বোন। এ ছাড়া একে অপরের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বান্ধবীও। এলিকে লেখা রবার্টের একটা চিঠি পড়ে লিজা বুঝতে পেরেছিল, রবার্টের কোন দুর্ঘটনা ঘটে গেলে তার বিরাট সম্পত্তির উত্তরাধিকারীণী হবে এলিই। তাৎক্ষণিকভাবে ব্যাপারটাকে ততটা গুরুত্ব না দিলেও কথাটা কিন্তু ঠিক ঠিকই মাথায় রয়ে গিয়েছিল লিজার। এরপর ঘটে গেল পরপর দুটো দুর্ঘটনা। অপারেশন করাতে গিয়ে মারা গেলেন রবার্টের দাদা। এর কয়েক দিন পর গ্লাইডারসহ নিখোঁজ হলো রবার্ট। চট্ করে কূটবুদ্ধি মাথা চাড়া দিয়ে উঠল লিজার।

'রবার্টের মত উড়নচণ্ডী মানুষ যে খুব সাধারণভাবে উইল করে যাবে–একথা বুঝতে বেশি বেগ পেতে হয়নি লিজার। এমনকি এলি এবং লিজা–দুজনের আসল নামই যে এলিজাবেথ গোমেজ, এটাও সম্ভবত রবার্টের জানা ছিল না। এদিকে পরিচিত মহল ও বন্ধু বান্ধব সবাই জানে রবার্টের সঙ্গে বন্ধুত্ব লিজার। উৎসাহী বন্ধু বান্ধবের কেউ কেউ এদের দুজনের সম্পর্কের মাঝে প্রেমের গন্ধ খুঁজে বেড়ালেও অবাক হবার কিছু নেই। অন্যদিকে এলির সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারটা লিজা ছাড়া আর কেউ জানে না। এখন রবার্ট মারা যাবার পর যদি সে দাবি করে যে, মৃত্যুর আগে তার সঙ্গেই ওর বাগদান হয়েছিল তা হলে অবাক হবে না কেউ। এ ছাড়া পরবর্তী সময়ে ওর উইল যখন প্রকাশ্যে ঘোষণা করা হবে তখন উত্তরাধিকারিণী হিসেবে এলিজাবেথ গোমেজকেই (লিজা) স্বীকৃতি দেয়

হবে। যদিও আমরা জানি, উইলের এলিজাবেথ গোমেজ আসলে এলি।

'কাজটা সাফল্যের সঙ্গে সমাধা করতে হলে এলিকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে হবে। ও তাড়াতাড়ি এলিকে খবর পাঠাল যাতে ওর এখানে এসে কয়েকদিন বেড়িয়ে যায়। আর এদিকে ওর মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যাওয়ার গল্পগুলো ও কায়দা করে সবার মাঝে প্রচার করতে আরম্ভ করল। অয়েল পেইন্টিংয়ের কর্ড ও নিজেই কেটেছিল, আর গাড়ির ব্রেক ফেল করার ব্যাপারটাও ওরই কারসাজি। এ ছাড়া ছোট ছোট ঢিবিগুলো থেকে পাথরের চাঁই গড়িয়ে দেয়ার গল্প বিশ্বাস করানোর জন্য কোন প্রমাণের প্রয়োজন পড়ে না।

'এসব ঘটনার পরপরই পত্রিকায় কিংবা লোকমুখে আমার কক্সবাজার আসার কথা জানতে পারে ও। সত্যি সাহস আছে মেয়েটার। আমাকে দলে ভিড়িয়ে নিয়ে ওর কার্যোদ্ধার করার মত স্নায়ুর জোর দেখে সত্যি অবাক হয়েছি আমি। আর কি অদ্ভুত কৌশল প্রথম দিনেই আমাকে ওর দলে ভিড়িয়ে নিল! একটা হ্যাট আগে থেকে পিস্তল দিয়ে গুলি করে সেই ব্যবহৃত গুলিটা কৌশলে ফেলে আসা এবং স্বেচ্ছায় হ্যাটটা হোটেলের লনে রেখে দিয়ে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করা–এ সমস্তই অত্যন্ত চতুরতার সঙ্গে সম্পন্ন করেছে সে। আর তখন থেকেই আমি হয়ে গেলাম ওর হাতের পুতুল। যেভাবে আমাকে খেলাতে চাইল, আমিও ঠিক সেবাবেই খেলে গেলাম। আর এতে সুবিধা হলো, ও যা-ই করুক না কেন, যেহেতু আমি ওর সঙ্গে সঙ্গেই আছি তাই ঘুণাক্ষরেও কেউ ওকে সন্দেহ করবে না। আমার তো সন্দেহ করার প্রশ্নই আসে না।

'হ্যাটের সেই ঘটনার পর আমি ওকে বললাম, কোন নিকট আত্মীয়কে কাছে এনে রাখতে। আমার কথায় সায় দিয়ে ও এলিকে নির্দিষ্ট দিনের একদিন আগেই এখানে আসার জন্য টেলিফোন করল। যেদিন এলি এসে পৌঁছল ঐদিন রাতেই তাকে খুন করা হলো। আর কত সহজে যে ও খুনটা করল, ভাবতেও অবাক লাগে। এলি গায়ের শাল খুঁজতে যাওয়ার পরপরই লিজাও ভেতরে গেল। তখন রাত প্রায় আটটা। যদিও সকালের খবরেই রবার্টের পরিণতি সম্বন্ধে জানা গেছে, তবু আটটার খবরে সেকথা আরেকবার শুনে নিশ্চিত হয়ে নিল ও। তক্ষুনি পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দিতে লেগে গেল। ড্রইংরুমের গুপ্ত কুঠুরি থেকে পিস্তলটা বের করা মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের ব্যাপার। ঐ সময় বাজি পোড়ানো দেখতে ব্যস্ত ছিল সবাই। আর তখন দোতলা থেকে লাশটা খুঁজে বের করে নিচে নামছে এলি, এমন সময় সিঁড়ির গোড়ায় দেখা হয়ে গেল দুজনের। কোন গোপন কথা বলবে বলে এলিকে বাড়ির পেছন দিকে নিয়ে গেল লিজা। তারপর

খুব সহজেই সাইলেন্সার লাগানো পিস্তল দিয়ে সমাধা করল তার আরাধ্য কাজটা। পিস্তলটা জায়গামত রেখে সবার সঙ্গে আবার যোগ দিল বাজি পোড়ানো দেখতে।

'অল্প কিছুক্ষণ পর আমরা মৃতদেহটা দেখতে পেলাম। লিজাও একটু পরে সেখানে এসে উপস্থিত। ও এলির মৃতদেহ দেখতে পেয়ে যে অভিনয়টা করল তা রীতিমত তাক লাগিয়ে দেয়ার মত। সত্যিই, কূটবুদ্ধি আর অভিনয়-এ দুটো বিষয়ে তুলনা হয় না ওর। বুয়া একদিন কথায় কথায় বলছিল, এই বাড়ির দেয়ালে কান পাতলে নাকি যতসব অশুভ আর অতিলৌকিক শক্তির আনাগোনা টের পাওয়া যায়। অমঙ্গল যেন সবসময় হাতছানি দিয়ে ডাকে। আমিও তার কথার সঙ্গে একমত না হয়ে পারছি না। এই বাড়িতে থেকেই লিজা এরকম জঘন্য অপরাধ করার উৎসাহ পেয়েছে।'

'আচ্ছা, চকোলেটের ব্যাপারটা আসলে কি?' জিজ্ঞেস করল রিয়া।

'এটাও পুরো পরিকল্পনারই একটা অংশ। আমরা এমনিতে সবাই বলাবলি করতাম, আততায়ী ভুল করে এলিকে লিজা ভেবে খুন করেছে। এখন এলির মৃত্যুর পরও যদি ওর উপর হামলা হয় তা হলে সবার মনে এই ধারণাটাই পাকাপোক্ত হবে যে, এলির মৃত্যুটা দৈবাৎ আততায়ীর ভুলের জন্যই হয়েছে। যখন লিজা বুঝতে পারল, উপযুক্ত সময় এসেছে তখন আপনাকে ফোন করে এক বাক্স চকোলেট পাঠানোর কথা বলল।'

'টেলিফোন গলাটা কি ওরই ছিল?'

'নয়তো কার? কথা বলার সময় ও কণ্ঠস্বরটাকে একটু অন্যরকম করেছিল যাতে আপনাকে জেরা করলে দ্বিধায় পড়ে যান। এখানে কাকতালীয়ভাবে কারোর পাঠানো চকোলেটের দ্বিতীয় বাক্সটা পুরো ব্যাপারটাকে আরও ঘোলা করে তুলল। যখন আপনার পাঠানো চকোলেটগুলো ও হাতে পেল তক্ষুণি লেগে গেল কাজে। কোকেনের নেশা আছে লিজার। ও জানে, চকোলেটে কি পরিমাণ কোকেন মেশাতে তা খেয়ে একজন অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে। সঙ্গে কোকেন রাখত ও। মোট তিনটে চকোলেটে কোকেন মেশানোর পর সেগুলো থেকে একটা খেয়েই এমন ভান করল, যেন জীবন বিপন্ন। আর ঐ কার্ডের ব্যাপারটা! ভেবে আশ্চর্য হই, কি শক্ত নার্ভ মেয়েটার! ফুলের তোড়ার সঙ্গে পাঠানো আমার কার্ডটাই ও চকোলেটের বাক্সে সবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে সেঁটে দিয়েছিল। সহজ ব্যাপার যদিও, তবু সময়মত ও বুদ্ধিটা কাজে লাগিয়েছিল দারুণ!'

'সবই না হয় বুঝলাম, কিন্তু আমার কোটের পকেটে ও পিস্তলটা রাখতে গেল কেন?'

'জানতাম, কথাটা একসময় আপনার মাথায় খেলবেই। আচ্ছা, একটু ভেবে বলুন তো, কখনো কি মনে হয়েছে যে লিজা আপনাকে আর তেমন একটা পছন্দ করে না? কিংবা এমন কি কখনো মনে হয়েছে, ও আপনাকে ঘৃণা করে?'

কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর বলল রিয়া, 'বলা খুবই কঠিন। তবে এটা ঠিক, বেশ কিছুদিন থেকে আমাদের আগের ঘনিষ্ঠতায় চিড় ধরেছে।'

'আচ্ছা, এবারে আপনি বলুন তো, ফিরোজ, আপনার সঙ্গে লিজার কি কখনো কোন হৃদয়ঘটিত ব্যাপার গড়ে উঠেছিল?'

'না, প্রেম বলতে যা বোঝায় ঠিক তেমন কোন সম্পর্ক ছিল না,' বলল ফিরোজ, 'তবে একসময় ওর প্রতি কিছুটা আকৃষ্ট হয়েছিলাম ঠিকই, কিন্তু কিছুদিন পর কি জানি কি হলো–ওর প্রতি আকর্ষণ গেল উবে।'

'আসলে এটাই লিজার জীবনের বড় একটা ট্র্যাজেডি-কৌশল খাটিয়ে মানুষের মনে অধিকার জন্মাতে পারে, কিন্তু ভালবাসা দিয়ে চিরদিনের জন্য কারো মন জয় করতে পারে না। আমার অনুমান যদি ভুল না হয় তা হলে বলব, আপনি যখন থেকে রিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হলেন, তখন থেকেই ও রিয়াকে হিংসা করতে আরম্ভ করেছে।'

'অথচ একসময় আমরা একে অপরের কতই না ঘনিষ্ঠ ছিলাম! আর অপারেশনের সময় ও যখন উইল করল তাতে বাড়িটা ছাড়া আর সব সম্পত্তিই আমার নামে লিখে দিয়েছিল,' একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল রিয়া।

'পরবর্তী সময়ে এটাকেই আপনার বিরুদ্ধে কাজে লাগানোর অপচেষ্টা করেছিল ও। উইলের বিষয়বস্তু অনেকেই জানত। সেদিক থেকে বিচার করলে সবাই আপনাকে সন্দেহ করবে। ব্যাপারটা ও নিজেও বুঝেছিল। আর তাই আপনাকেই চকোলেট পাঠাতে বলেছিল, যাতে সাধারণ লোকের ধারণা হয়, আপনিই চকোলেটে কোকেন মিশিয়ে ওকে খুন করার চেষ্টা করছেন।

'এদিকে উইল নিয়ে আরও একটা মজার ব্যাপার হয়েছে। লিজা ওর উইলটা ডি কস্টাদের দিয়েছিল অ্যালবার্টের ঠিকানায় পোস্ট করার জন্য। ওরা তা না করে মূল উইলটাকে নষ্ট করে ফেলে একটা জাল উইল তৈরি করল এবং সেটা নিজেদের কাছে রেখে দিল। তাতে লিজার সম্পত্তির স্বত্বাধিকারিণী হিসেবে মিসেস ডি কস্টার নাম উল্লেখ আছে।'

'তা হলে উইলটা কি আগাগোড়াই জাল?' জিজ্ঞেস করল ফিরোজ।

'অবশ্যই! ডি কস্টারা এর আগেও জালিয়াতির মাধ্যমে অসংখ্য লোককে ঠকিয়েছে। হাতের লেখা নকলে ওরা এতই দক্ষ যে লিজা, বুয়া ও মালীর স্বাক্ষর পর্যন্ত হুবহু নকল। এদিকে লিজার অপারেশন নিরাপদেই সম্পন্ন হলো, আর ওদের পরিকল্পনা সাময়িকভাবে ভেস্তে গেল। কিন্তু ওরা

আবার আশার আলো দেখতে পেল যখন লিজা তার উপর হামলার কাল্পনিক কাহিনিগুলো লোকজনের কাছে বলতে শুরু করল। আমরা লিজার মৃত্যু সংবাদ রটিয়ে দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওরা উইলটা পোস্ট করে দিল অ্যালবার্টের ঠিকানায়। এখানে আরেকটা কথা, ডি কস্টারা কিন্তু লিজাকে অনেক বেশি ধনী ঠাওরাতো আসলে যতটা সে নয়। খুব সম্ভবত বাড়ি বন্ধকের ব্যাপারটাও জানত না ওরা।'

'যে কথাটা আপনাকে অনেকক্ষণ থেকেই জিজ্ঞেস করব করব ভাবছি,' বলল ফিরোজ, 'তা হলো,আপনি ঠিক কখন থেকে লিজাকে সন্দেহ করতে শুরু করলেন?'

'ওহ্, সেকথা আর বলবেন না' এই লিজা আমাকে কি রকম ঘোল খাইয়েছে, ভাবতেও অবাক লাগে। ওকে সন্দেহ করা দূরে থাকুক, ওর প্রতিটি কথাই আমি অন্ধের মত বিশ্বাস করে গেছি। অবশ্য মাঝেমধ্যে একটা ব্যাপার মনের ভেতর খচ্‌খচ্ করত পুরো ঘটনাপ্রবাহে লিজার বক্তব্য আর ওর বন্ধু-বান্ধব কিংবা পরিচিতদের বক্তব্যের মাঝে বিস্তর ফারাক। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার। অন্যদের কথায় গুরুত্ব না দিয়ে আমি কেবল লিজার কথাকেই বিশ্বাস করে গেছি। কিন্তু হঠাৎ একটা ব্যাপারে খটকা লাগল–সে কথায় পরে আসছি। যখন ওর ওপর কাল্পনিক হামলার গল্পগুলো বিশ্বাস করলাম, আমি তখন ওকে বললাম কোন নিকট আত্মীয়কে কাছে এনে রাখতে। ও এলিকে টেলিফোন করে এখানে আসতে বলল। এলি লিজার এখানে এল মঙ্গলবার বিকেলে। এদিকে এলির বাবা-মা মৃতদেহ নিয়ে চট্টগ্রাম পৌঁছে একটা চিঠি পান। চিঠিটা এলি এখানে এসেই লিখেছিল। এলির মা ঐ চিঠিটা আমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। উনি অবশ্য বিনয়ের সাথে ওঁর চিঠিতে উল্লেখ করেছিলেন, ঐ চিঠিতে হয়তো এমন কিছু নেই যা তদন্তের কাজে লাগতে পারে। সত্যিই তাই। কিন্তু দ্বিতীয়বার সেটা পড়তে গিয়ে এক জায়গায় এসে খটকা লাগল। এলি লিখেছে, '...ভেবে পাচ্ছি না, আমাকে টেলিফোন করার এমন কি দরকার পড়ল, বুধবারের ব্যাপারে আগে থেকেই তো সবকিছু ঠিকঠাক ছিল..." এখানে এই "বুধবার" কথাটার অর্থ কি? অর্থ একটাই–এলির এখানে আসার ব্যাপারে আগে থেকেই কথাবার্তা ঠিকঠাক ছিল। তা হলে দাঁড়াচ্ছে এই, যে কোন কারণেই হোক, কথাটা লিজা আমার কাছে বেমালুম চেপে গেছে, কিংবা সত্য গোপন করেছে।

'তখন থেকেই আমি পুরো ঘটনাটাকে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করতে লাগলাম। লিজার সমস্ত বক্তব্য সরাসরি বিশ্বাস না করে মনে মনে বললাম, যদি ওর একটা কথাও সত্যি না হয়? তারপর এপর্যন্ত যা ঘটেছে তার খুব সহজ বিশ্লেষণ করলাম। নিজেকেই প্রশ্ন করলাম, এ পর্যন্ত সত্যি সত্যিই কি ঘটেছে?

উত্তরঃ এলি খুন হয়েছে। এলিকে খুন করে কার লাভ?–কথাটা মাথায় আসতেই বিদ্যুৎচমকের মত একটা কথা মনে পড়ে গেল। আজ দুপুরের দিকে কথায় কথায় হাবিব এলিজাবেথ নামটার কতগুলো সংক্ষেপে হয় সেকথা বলছিল। হঠাৎ মনে হলো, আচ্ছা, এলির আসল নাম কি? সেও তো গোমেজ পরিবারের মেয়ে। যদি ওর নামও এলিজাবেথ গোমেজ হয়ে থাকে, তা হলে? এলি তো এলিজাবেথেরই আরেকটা সংক্ষিপ্ত রূপ। দুই এলিজাবেথ গোমেজ...। দেরি না করে চট্টগ্রাম এলির মাকে টেলিফোন করলাম। আমার অনুমানই ঠিক। এলির আসল নামও এলিজাবেথ গোমেজ। তারপর আরেকটা কথা মনে হলো। লিজার চেষ্ট অভ ড্রয়ারে রবার্টের লেখা চিঠিগুলোর কথা। না, কিছুই অসম্ভব নয়। চিঠিগুলোর একটাতে চট্টগ্রামের উল্লেখ আছে। আর আমরা এ-ও জানি, লিজা আর রবার্ট যখন চট্টগ্রামে বেড়াতে যায় তখন রবার্টের সঙ্গে পরিচয় হয় এলির। এ ছাড়া চিঠিগুলোর ব্যাপারে আরেকটা খটকা লাগল। বাণ্ডিলটাতে মাত্র এই ক'টা চিঠি কেন? কোন মেয়ে তার সমস্ত প্রেমপত্র এক জায়গায় রাখবে–এটাই স্বাভাবিক। চিঠিগুলোর বিশেষত্ব কি এটা ভাবতে গিয়ে একটা জিনিস আবিষ্কার করলাম। চিঠিগুলোতে কোন নামের উল্লেখ নেই–আছে আদুরে সম্বোধন। আরও একটা ব্যাপার যা তক্ষুণি বোঝা উচিত ছিল। কিন্তু বুঝেছি অনেক পরে।'

'কি সেটা?' জিজ্ঞেস করল হোবার্ট।

'লিজার অপারেশন হয়েছিল ফেব্রুয়ারীর শেষদিকে। আর রবার্টের লেখা একটা চিঠির তারিখ ২ মার্চ। কিন্তু ঐ চিঠিতে অপারেশন সংক্রান্ত দুশ্চিন্তার কোন চিহ্নই নেই। এ থেকে একটা ব্যাপারই পরিষ্কার হয়–চিঠিগুলো অন্য কাউকে লেখা। এখানে আরও দু'টো ব্যাপার উল্লেখ করা দরকার। রবার্ট যে তার সম্পত্তি এলিকেই উইল করে দিয়েছে সেকথা লিজা বুঝেছিল এই চিঠিগুলো পড়ে। আর উইলে এলির বাবার নাম উল্লেখ ছিল না। ছিল দাদার নাম। এটাও এই চিঠিগুলো পড়ে জেনেছিল ও। আরও একটা কথা। ওকে উইলটা কোথায় রাখা আছে জিজ্ঞেস করাতে বলেছিল–সম্ভবত বাড়ির চেষ্ট অভ ড্রয়ারে। কিন্তু আসলে তো উইলটা ডি কস্টাদের দিয়েছেল অ্যালবার্টের ঠিকানায় পোস্ট করার জন্য। অবশ্য পরে ও নিজে থেকেই কথাটা স্বীকার করেছিল। কিন্তু প্রথমবার ও চেষ্ট অভ ড্রয়ারের কথা বলল কেন? এখানেও উত্তর একটাই। আমরা যাতে চিঠিগুলো দেখতে পেয়ে ওর সঙ্গে রবার্টের বাগদানের ব্যাপারে নিশ্চিত হই। ও ঘুণাক্ষরেও ভাবেনি, এই চিঠিগুলোই শেষ পর্যন্ত আমাদের রহস্য উদঘাটনে সাহায্য করবে।

'এ ছাড়াও আরও দু'একটা ছোট ছোট ঘটনা-সেগুলোকে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করলাম। একটা উদারহরণ দিই। ঐ দিন রাতে লিজা কালো কাপড় পরেছিল কেন? উত্তর খুব সহজ। ওকে আর এলিকে

যাতে অন্ধকারে একই রকম দেখায়–শুধু এটা প্রমাণের জন্য যে আততায়ী অন্ধকারে এলিকেই লিজা ভেবে ভুল করেছে। অথচ এর আগে মনে হয়েছিল, রবার্টের শোকেই বুঝি বা কালো কাপড় পরেছে ও। কারো মৃত্যু-সংবাদ সম্বন্ধে নিশ্চিত না হয়ে কেউ শোক প্রকাশের জন্য কালো কাপড় পরে না।

'এরপর আমি এই নাটকের অবতারণা করলাম। লিজা গুপ্ত কুঠুরির ব্যাপারটা জোর গলায় অস্বীকার করত। এর কারণ কি? অন্যদিকে বুয়া বলছে, এরকম একটা কুঠুরি আছে। কিন্তু সেটা ঠিক কোথায় এখন আর সেকথা তার মনে নেই। তা ছাড়া বুয়ার মিথ্যে কথা বলা প্রয়োজনই বা কি! তা হলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে; বিশেষ কোন কারণে হয়তো লিজাই মিথ্যে কথা বলছে। সম্ভবত ঐ কুঠুরিতে পিস্তলটা লুকানো আছে। পিস্তলটা লুকিয়ে রাখার কারণ হচ্ছে পরবর্তী কোন সময় ওটার সাহায্য বিশেষ কারো উপর আমাদের সন্দেহ জাগিয়ে তোলা। ওকে আকার-ইঙ্গিতে বোঝালাম, পুরো ঘটনায় আমি রিয়াকেই জোর সন্দেহ করছি। আর তাই রিয়াকে ফাঁসানোর জন্য মনে মনে মতলব আঁটল ও। এ ছাড়া ওখান থেকে পিস্তলটা সরানোর প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। বলা তো যায় না, বুয়া কখন আবার কুঠুরিটা আবিষ্কার করে ফেলে!

'আমরা যখন ডাইনিং হলে সবাই জমায়েত, তখনি কাজটা সেরে ফেলল ও। ভেবেছিল, কেউ দেখতে পাবে না–কিন্তু জাফরকে আগে থেকেই নির্দেশ দেয়া ছিল, তাই শেষরক্ষা আর হলো না।'

'ঘড়িটা একরকম জোর করেই নিয়ে গেল ও,' স্বগতোক্তির মত শোনাল রিয়ার কথাগুলো।

'হ্যাঁ, জানি।' গম্ভীর কণ্ঠস্বর আসাদের।

কয়েক মুহূর্ত সবাই চুপচাপ–। হঠাৎ অ্যালবার্ট বলল, 'ভাবছি, লিজার আত্মপক্ষ সমর্থনের কি ব্যবস্থা করা যায়!'

'আমার অনুমান যদি ভুল না হয়ে থাকে, তা হলে তার আর দরকার হবে না,' বলল আসাদ। তারপর কঠোর দৃষ্টিতে চাইল হোবার্টের দিকে, 'ব্যবসাটা ভালই ফেঁদেছেন, তাই না? ঘড়ির ভেতরে করে জিনিসটা এনে ভাল খদ্দের জুটিয়েছেন আপনি!'

'আমি...আমি...।' কিছু একটা বলতে গিয়েও বাক্‌শক্তি যেন লোপ পেল ওর।

'আমার চোখে ধুলো দেয়ার চেষ্টা করে কোন লাভ নেই, হোবার্ট। আপনার ভালমানুষী চেহারা হাবিবকে মুগ্ধ করলেও এ ব্যাপারে আপনাকে আমি প্রথম থেকেই সন্দেহ করেছিলাম। বিষয়টা যদি পুলিশের গোচরে

আনতে না চান, তা হলে এক্ষুনি এখান থেকে চলে যান।'

আসাদের কথায় রাগে ফর্সা চেহারা লাল হয়ে উঠল হোবার্টের তবু কোন কথা না বাড়িয়ে ধীর পায়ে রুম ছেড়ে চলে গেল ও। ওর গমন পথের দিকে চেয়ে রইলাম–সত্যিই, চিনতে বোধহয় ভুলই করেছিলাম ওকে।

'তা হলে এভাবেই কোকেনের চোরাচালান হচ্ছিল এখানে?'

'হ্যাঁ, আর এসবের হোতা তোমার সেই ভালমানুষ ক্যাপ্টেন হোবার্ট। লিজা চকোলেটের সঙ্গে যে কোকেন মিশেয়েছিল সেটা ওরই সরবরাহ করা। ঐদিন চকোলেটে কোকেন মিশিয়েছিল সামান্যই। কিন্তু আজ অনেকটা কোকেনের দরকার হবে লিজার।'

'মানে? তুমি কি বলতে চাও...?'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই। ফাঁসির রজ্জুর চেয়ে এই-ই ভাল। এই, আস্তে,' হেসে বলল আসাদ, 'আমাদের মাঝে অ্যালবার্ট আছেন। তাঁর মত একজন ন্যায়পরায়ণ লোকের সামনে এসব কথা বলা সাজে না। আসলে কি, জানেন, আমি এই কোকেনের ব্যাপারে সত্যি সত্যিই কিছু জানি না–এর সমস্তই আমার অনুমান মাত্র!'

'আপনার অনুমান কিন্তু সব সময়ই সঠিক হয়,' বলল অ্যালবার্ট। 'না, রাত অনেক হয়েছে। আর দেরি করা যায় না। আমাকে এবার উঠতে হবে,' সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল সে।

আসাদ এবার ফিরোজের দিকে চেয়ে বলল, 'শুভ কাজটি খুব তাড়াতাড়িই সেরে ফেলবেন বলে মনে হচ্ছে?'

'হ্যাঁ, এ ব্যাপারে খুব বেশি দেরি করার ইচ্ছে আমার নেই। কিন্তু তার আগে ব্যবসাটা আর একটু গুছিয়ে নিতে হবে।'

'একটা কথা আপনাকে না বলে শান্তি পাচ্ছি না, আসাদ সাহেব,' বলল রিয়া, 'আপনি হয়তো প্রথম থেকেই আমাকে নেশাখোর ঠাওরে আসছেন। কিন্তু বিশ্বাস করুন, এক সময় স্বামীর প্ররোচনায় কিছুটা বিপথে পা বাড়ালেও এখন আর আসক্ত নই আমি। ডোজ কমিয়ে আনতে আনতে এখন একেবারে ছেড়ে দেয়ার শেষ পর্যায়ে আছি।'

'সে-ই ভাল। এ এক সর্বনাশা নেশা। একবার ধরলে সহজে কেউ ছাড়তে পারে না। আপনার প্রচণ্ড মনোবল এই অসাধ্য সাধনে সাহায্য করেছে। যাক, ভবিষ্যতের ব্যাপারে কি ভাবছেন?'

'এক সুন্দর অনাগত ভবিষ্যৎ হাতছানি দিয়ে ডাকছে আমায়,' আবেগপ্রবণ হয়ে উঠল রিয়া, 'সেই ভবিষ্যতের ডাককে অবহেলা কিংবা উপেক্ষা করতে চাই না আমি। কয়েকটা বছর তো কম যন্ত্রণা সহ্য করলাম না! এবার নিশ্চয়ই পরম করুণাময় আমার দিকে মুখ তুলে চাইবেন।'

'আমি আপনাদের জন্য দোয়া করি, যাতে আপনারা সুখী হতে পারেন।'

'ইদানীং ব্যবসা বেশি ভাল যাচ্ছে না আমার,' বলল ফিরোজ, 'জানি না, এই গরীবী হালে ওকে কতটুকু সুখী করতে পারব। তবু, মনে হয় আমার এই অবস্থাটা হয়তো মেনে নেবে ও। কি, রিয়া, কিছু একটা বলো!'

মাথা নেড়ে ফিরোজের দিকে চেয়ে মুচকি হাসল রিয়া। ঘড়ি দেখল আসাদ। কথায় কথায় অনেক রাত হয়েছে। যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালাম সবাই। হঠাৎ লিজার দাদার অয়েল পেইন্টিংটার দিকে নজর গেল আসাদের। বেরুতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল ও। ফিরোজের হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল অয়েল পেইন্টিংটার সামনে। 'শুধু একটা কথা জানতে বাকি আছে, আর সেটা আমি আপনার কাছ থেকেই জানতে চাই।'

'বেশ বলুন!'

'আচ্ছা, এই ছবিটা আপনি কেন পাঁচ হাজার টাকায় কিনতে চেয়েছিলেন? অথচ বিশেষজ্ঞ দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে জানা গেছে ছবিটার দাম কোমতেই দু-হাজার টাকার বেশি হবে না।'

কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বলল ফিরোজ, 'মি. রহমান, আমি কিন্তু একজন জাত ব্যবসায়ী।'

'ঠিক। কিন্তু তা হলে...?'

'আপনি যেমন জেনেছেন, আমিও ঠিক তেমনিই ভাল করেই জানি, অয়েল পেইন্টিংটার দাম কোনমতেই দু-হাজারের বেশি হবে না। লিজার বরাবরের ধারণা, কোন কিছু বেচাকেনার সময় লোকজন ওকে ঠকাতে চায়। তাই সে-ও ওটার দাম নিশ্চয়ই যাচাই করে থাকবে। আর যখন জানবে যে আসল দামের অনেক বেশি দিয়ে ছবিটা আমি কিনতে চাইছি, তখন দ্বিতীয়বার এরকম আর একটা ছবি বিক্রির সময় ও আর দাম যাচাই করতে যাবে না।'

'বেশ। কিন্তু...।'

'ঐ যে দেখুন,' দূরে টাঙানো একটা অয়েল পেইন্টিংয়ের দিকে তর্জনী তুলল ফিরোজ, 'ঐ অয়েল পেইন্টিংটার দাম কম করে হলেও বিশ হাজার টাকা।'

'হ্যাঁ, এতক্ষণে ব্যাপারটা পরিষ্কার হলো।'

ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হোটেলের পথে পা বাড়ালাম আমরা।

মূল কাহিনি: *আগাথা ক্রিস্টির 'পেরিল অ্যাট এণ্ড হাউস'*

রূপান্তর: **কাজী সারওয়ার হোসেন**